AKS

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

১ প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

চিত্রশিল্পী :
শৈল চক্রবর্তী
ধীরেন বল

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য
মণীন্দ্র প্রেস
৮বি, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

উপহার

সূচীপত্র

বল্টুদার উৎসাহলাভ

আমি বরাবর দেখেছি, আমাদের বল্টুদার যখন তেজ এসে যায়, তখন তাকে ঠেকানো ভারী মুশকিল।

রবিবার সকালে দিব্যি চাটুজ্জেদের রকে বসে আছি আর একটা কাকের পালক কুড়িয়ে নিয়ে আরামে কান চুলকোচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে বল্টুদা এসে হাজির। বললে, চল্ প্যালা—একটু বেরোনো যাক।

—কোথায় যেতে হবে?

—মানে বন্ধু-বান্ধবদের একটু উৎসাহ দেওয়া দরকার। দেখছিস্ নে- সব কেমন মিইয়ে যাচ্ছে?

শুনে কানের ভেতর আচমকা একটা পালকের খোঁচা লেগে গেল।

—সে আবার কী? কাকে তুমি উৎসাহ দেবে?

—যাকে পাই। বুঝলি, চারদিকে সবাই যেন কি রকম দমে যাচ্ছে। এই তো সেদিন তোর বন্ধু হাবুল সেনকে বললুম, 'চল হাবলা, একটা অ্যাডভেঞ্চারের ফিল্মি হচ্ছে —দুজনে মিলে দেখে আসি। তোর পকেটে যদি পাঁচ সিকের পয়সা থাকে, তা হলেই হয়ে যাবে এখন।' বললে বিশ্বেস করবি না প্যালা, হাবুল একেবারে খ্যাঁক করে উঠল। আমার নাকের সামনে হাত নেড়ে বললে 'থাউক, অত আহ্লাদ করতে হইবো না। যাইতে হইলে একাই যামু—তোমারে নিমু ক্যান্?' শুনলি একবার কথাটা? দেশের এ কী অবস্থা হল বল্ দিকি?

আমি বললুম, হুঁ—দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু তাই বলে যদি আমাকে উৎসাহ দিতে এসে থাকো, তবে সুবিধে হবে না তা বলে দিচ্ছি। আমার পকেটে ঠিক তিনটে নয়া পয়সা আছে। চাও তো তা থেকে একটা তোমায় দিতে পারি।

বল্টুদা নাকটাক কুঁচকে মুখটাকে মোগলাই পরোটার মত করে বললে, থাক থাক,

তোকে আর দয়া করতে হবে না। তুই যে এক নম্বরের ট্যাঁক-খালির জমিদার সে আর আমি জানিনে? চল্—আমাদের অভিলাষকে একটু উৎসাহ দিয়ে আসি।

অভিলাষের নাম শুনে আমার কান খাড়া হয়ে উঠল।

—কোন্ অভিলাষ? ওই যে সিনেমার সামনে নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে?

বল্টুদা বললে, আবার কে? উৎসাহ দিতে হলে ভালো ভালো লোককেই দেওয়া উচিত—আজে বাজে লোককে দেওয়া আমি পছন্দ করি না। নে—উঠে পড়—

তক্ষুণি উঠে পড়লুম।

—কী রকম উৎসাহ দেবে বল্টুদা?

—চল্ না, দেখতেই পাবি।

পরমানন্দে উঠে পড়লুম। আমার আর ভাবনা কী। পকেটে তো মোট তিনটে নয়া পয়সা। তা ছাড়া বল্টুদার মনে যখন একবার উৎসাহ দেবার তেজ এসে গেছে তখন আর ওকে ঠেকাবে কে!

—ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—বলতে বলতে বল্টুদার পেছু নিলুম।

অভিলাষ আমাদের পাড়ার ছেলে। ওর বাবার মস্ত বড় পটোলের ব্যবসা। তাই অভিলাষকে বেশি লেখাপড়া না শিখিয়ে পটোলের ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দু-বছর ধরে অভিলাষ এমন ব্যবসা করলে যে পটোলের দোকান পটোল তোলে আর কি! তখন ওর বাবা রেগে মেগে ওকে কষে দুটো থাপ্পড় দিলেন। অভিলাষ তাই শেষ পর্যন্ত এই রেস্তোরাঁ খুলেছে আর মনের দুঃখে পটোল ভাজা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

আমরা যখন গেলুম, তখন ওর দোকানে বিশেষ লোকজন নেই। একজন ঝাঁটা-গুঁফো ভদ্রলোক তারিয়ে তারিয়ে ডিমের পোচ খাচ্ছে, আর এক বুড়ো নাকের ডগায় খবরের কাগজটা ধরে বসে আছেন।

আমাদের দেখেই অভিলাষের হাসি কান ছাপিয়ে, নাকের ডগা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

—এই যে এসো বল্টুদা—আয় প্যালা—

* বণ্টুদার উৎসাহলাভ *

বণ্টুদা আর আমি ততক্ষণে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছি। বণ্টুদা বললে, আরে আসব বই কি! তুই বললে আসব, না বললে আসব, তাড়িয়ে দিলেও ফিরে আসব।

শুনে অভিলাষ 'হেঁ– হেঁ' করল।

—আরে তাড়াব কেন? তোমরা হলে খদ্দের—দোকানের লক্ষ্মী। কী খাবে বলো এখন।

বণ্টুদা বললে, কী খাব না, তাই বল্। তোকে উৎসাহ দেবার জন্যেই তো প্যালাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। তোর কেক খাব, বিস্কুট খাব, টোস্ট খাব, ওম্‌লেট খাব, চপ—কাটলেট– মাংস—ও, সেগুলো বুঝি এবেলা হয় না? আচ্ছা বেশ—চপ—কাটলেট-গুলো সন্ধ্যেবেলায় এসেই খাওয়া যাবে তা হলে। এখন চা খাব, কফি খাব—

আমি বললুম, যদি আরো বেশি উৎসাহ পেতে চাস, তা হলে তোর কাপ—ডিশ-চামচে—কাঁটাগুলোও খেতে পারি।

অভিলাষ দারুণ খুশি হতে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে যেন একটু নার্ভাস্ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, না– না, কাপ-ডিশগুলো বরং—

—তুই আপত্তি করছিস্?—বণ্টুদা বললে, আচ্ছা, ওগুলো তবে থাক। আর যদ্দূর মনে হচ্ছে কাপ-ডিশ খেতে খুব ভালো লাগবে না, কাঁটা-চামচে খাওয়াও বেশ শক্ত হবে। তবে প্যালার যদি খুবই ইচ্ছে হয়ে থাকে, একটা ভাঙা পেয়ালা বরং ওকে দে—বসে বসে চিবোক। আর আমার জন্যে দুখানা প্লাম কেক, চারটে টোস্ট, দুটো ডবল ডিমের ওম্‌লেট—

আমি ভীষণ প্রতিবাদ করে বললুম, না, আমি কক্ষনো ভাঙা কাপ খাব না। আমিও কেক, টোস্ট, ওম্‌লেট এইসবই খেতে চাই।

অভিলাষ বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুইও খাবি। একটু বোস—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

প্রায় নাচতে নাচতে চলে গেল অভিলাষ। বোধ হয় ভাবছিল সকালে কার মুখ দেখেই উঠেছে আজকে। কমসে কম তিন টাকা করে ছ'টাকার খদ্দের। কিন্তু আমি বণ্টুদাকে চিনে থাকি তা হলে—

এদিক বুড়ো ভদ্দরলোক উঠে যেতেই ছোঁ মেরে খবরের কাগজটা তুলে এনেছে বল্টুদা। একমনে খেলার খবর পড়ছে।

বললুম, বল্টুদা—

—উঁ!

—পকেটে টাকা-ফাকা আছে তো? না তোমার পাল্লায় পড়ে ঠ্যাঙানি খাব শেষ পর্যন্ত?

বল্টুদার নাকের ডগায় একটা মাছি অনেকক্ষণ ধরে পজিশন নেবার চেষ্টা করছিল। খবরের কাগজের ঘা খেয়ে সেটা পালালে। বল্টুদা আমার কথা শুনে উঁচুদরের একটা হাসি হাসল—বাংলায় যাকে বলে হাই ক্লাস।

—কে ঠ্যাঙাবে? অভিলাষ? না ও তেমন ছেলে নয়।

—তাই নাকি?—আমার খট্‌কা তবুও যেতে চায় না। জিজ্ঞেস করলুম, কী করে জানলে?

—ও যখন পটোলের দোকানে বসত—জানিস্ তো? সেই যখন দোকানের পটোল তোলার জো হয়েছিল? সেই সময় একদিন ও একা দোকানে বসে রয়েছে, দুজন লোক এসে হাজির। একজন বললে, 'খোকন, আমায় পটলডাঙার টেনিদার বাড়িটা চিনিয়ে দিতে পারো?' ও বললে, 'ওই তো—বাটার দোকানের পাশ দিয়ে চলে যান।' শুনে লোকটা বললে, 'আমি কলকাতায় নতুন এসেছি ভাই—পথ-ঘাট কিছু চিনিনে। একটু আসবে সঙ্গে?' অভিলাষ বললে, 'আমি যে দোকানে একা আছি!' লোকটা বললে, 'তাতে কী—আমার সঙ্গের বন্ধুটি তোমার দোকান পাহারা দেবে।' শুনে অভিলাষ তো তাকে এগিয়ে দিতে গেল।

পটলডাঙার গলিতে ঢুকেই লোকটা একদম ভ্যানিশ। 'ও মশাই, কোথায় গেলেন' বলে অভিলাষ একঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে মিথ্যে গরু খোঁজা করে, ফিরে এসে দেখে লোকটার সঙ্গীও নেই। আর নেই—

বললুম, কী নেই?

বল্টুদা বললে, এক ঝুড়ি পটোল। ভীষণ মন খারাপ করে হিসেবের খাতায় লি

* বল্টুদার উৎসাহলাভ *

রাখলে : "সাত সের তের ছটাক পটল কেহ বাকীতে লইয়া গেল। তাহার নাম-ঠিকানা কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না।" আর সেই হিসেব দেখে ওর বাবা—

—ওর বাবা কী করলে ?

বল্টুদা চোখ মিট-মিট করে বললে, পরে বলব। ওই যে অভিলাষ আসছে।
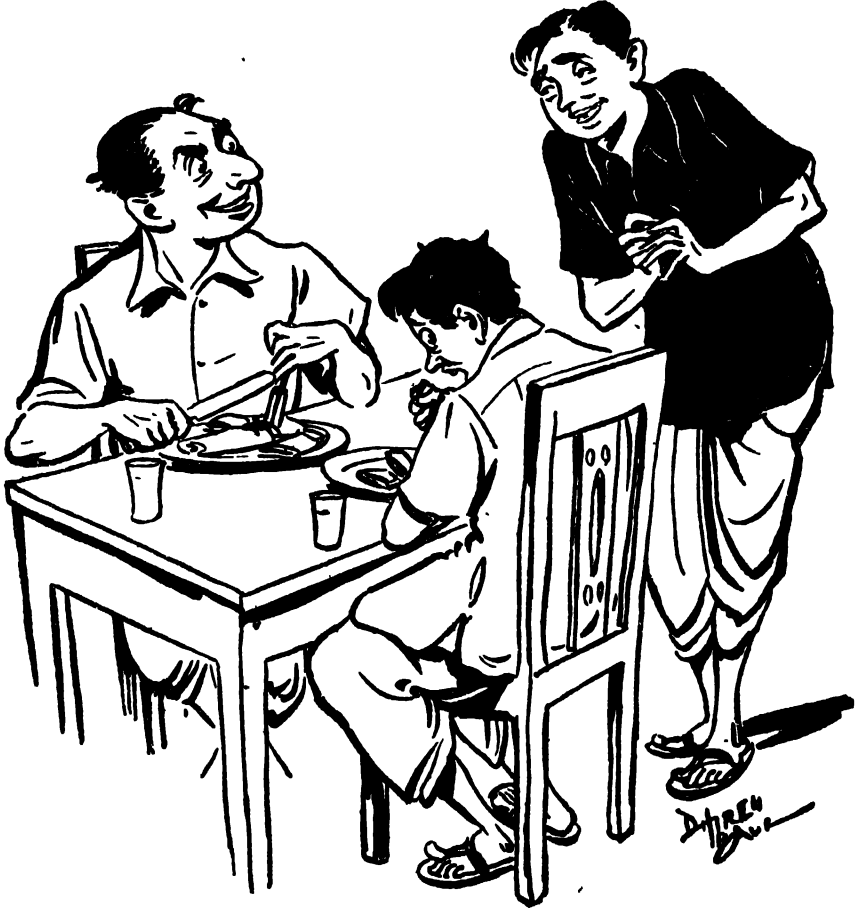
তোকে উৎসাহ দিতেই এলুম অভিলাষ !

সত্যই অভিলাষ আসছে। নিজের হাতে করে আনছে ছুটো প্লেট। তাতে ডবল ডিমের ওম্‌লেট, ছুটো করে প্লাম কেক আর চারটে করে টোস্ট।

বল্টুদা বললে, বাঃ, তোফা!—তারপর প্রায় অভিলাষের হাত থেকে প্লেট কেড়ে নিয়েই খাওয়া শুরু করে দিল। আর আহ্লাদী আহ্লাদী মুখ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল অভিলাষ। কী খুশি!

—ওম্‌লেট কেমন হয়েছে বল্টুদা?

—খাসা! তোকে তো উৎসাহ দিতেই এলুম অভিলাষ! তোর ওম্‌লেট খেয়েই বুঝতে পারছি-- তোর ভবিষ্যৎ কী নিদারুণ উজ্জ্বল!

অভিলাষের চোখ-মুখ চক-চক করে উঠল।—তাই নাকি?—

—তবে আর বলছি কী? তোর রেঁস্তোরাঁ দিনের পর দিন ফেঁপে উঠবে, দেলখোসকে মেরে বেরিয়ে যাবে।

—সত্যি?—আনন্দে অভিলাষ বার ছুই খাবি খেল।

—তা ছাড়া কী? তারপর তোর রেঁস্তোরাঁ আরো বড় হবে—গ্র্যাণ্ড হোটেলকেও ছাপিয়ে উঠবে। গ্রেট ইস্টার্ণ বা ফিরপোতে না গিয়ে দলে দলে লোক ছুটে আসবে তোর দোকানে। চাং-ওয়ার চাউ চাউ হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকবে আর তুই গদী-আঁটা চেয়ারে বসে খালি টাকা গুনতে থাকবি।

বক্তৃতা আর খাওয়া সমানে চলছে বল্টুদার। আমিও যতটা পারি চট্‌পট্ প্লেট সাফ করছি। কখন যে কী হয়ে যায় কিছুই তো বলা যায় না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ নেচে নিলে অভিলাষ; তারপর দৌড়ে যেতে যেতে বলে গেল, বোসো, তোমাদের জন্যে ভালো করে ডবল কাপ চা নিয়ে আসি ছুটো।

বল্টুদা শেষ প্লাম কেকটা গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বললে, কেমন বুঝছিস্?

বললুম, ভালো নয়। পকেটে যদি টাকা না থাকে—

—টাকা? টাকা কী হবে? উৎসাহ দেবার শক্তি থাকলেই যথেষ্ট। দেখছিস্ না—এর মধ্যেই কেমন নাচতে শুরু করেছে অভিলাষ? আর তাও ভেবে ছাখ প্যালা—

ঝট্ করে কি রকম ওর রেঁস্তোরাঁটাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলের চাইতেও বড় করে দিলুম। আর কী চাই? হুঁ হুঁ!

—মুখে বললেই তো হয় না!

—মুখে বলব না তো কান দিয়ে বলব নাকি? কিন্তু তুই তো আমায় ভাবিয়ে তুললি, সত্যিই তো—কান দিয়ে কি বলা যায়? অবিশ্যি নাক দিয়ে কেউ কেউ ঘুমের সময় বলে বটে, কিন্তু কী যে বলে তা বোঝাই যায় না। বোধ হয় হিব্রু বলে। না কি জার্মান ভাষা? ঘুঁ-ঘুরুর্—ঘুঁরুর্— আচ্ছা, চীনে ভাষা না তো? তোর কী মনে হয় প্যালা?

নাকের ডাকের ভাষাটা যে কী বোঝবার আগেই অভিলাষ চা আনল। কী মনে হয় তা আর বলতে পারলুম না।

বল্টুদা আর আমি বেশ মন দিয়ে চা-টা শেষ করলুম। তারপর ধীরে সুস্থে—গোটা দুই ঢেঁকুর তুলে বল্টুদা উঠে দাঁড়াল। আমিও তক্ষুণি একেবারে দোরগোড়ায়—এইবারে যা হওয়ার হবে—এস্পার ওস্পার।

বল্টুদা বললে, জোর খাইয়েছিস্! দ্যাখনা—বছর ঘুরতে না ঘুরতে তুই দেলখোসকে মেরে দিবি। তারপর ফিরপো—গ্রেট্ ইস্টার্ণ—গ্র্যাণ্ড হোটেল—

আনন্দে অভিলাষ হাঁসের মতো হাঁসফাঁস করতে লাগল।

—তা হলে চলি—

—এই যে বিলটা—অভিলাষ একখানা কাগজ এগিয়ে ধরল: পাঁচ টাকা বারো আনা—

—কিসের বিল? কিসের টাকা?—বল্টুদা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

আর অভিলাষ পড়ল—না, আকাশ থেকে নয়, সোজা স্পুটনিক থেকে।

—বা-রে, পাঁচ টাকা বারো আনার খেলে দুজনে মিলে?

বল্টুদা বললে, মোটে পাঁচ টাকা বারো আনার? তা হলে তো তোর কাছে আরো চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা পাওনা রইল।

অভিলাষ এবার স্পুটনিক থেকে—না-না, সোজা চাঁদ থেকে পড়ল। পাঁচ বার খাবি

খেয়ে বললে, চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা মানে? আমি আবার কবে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি? কক্ষণো না। তুমি এক পয়সাও পাও না আমার কাছ থেকে।

—বটে? বসে বসে পঞ্চাশ টাকার উৎসাহ দিইনি এতক্ষণ? বলিনি—লেগে থাক অভিলাষ—শেষে গদী-আঁটা চেয়ারে বসে টাকা গুনবি? সেই থেকে তো মোটে পাঁচ টাকা বারো আনা শোধ হল।

অভিলাষ বললে, আঁ—আঁ—আঁ—

—আঁ-আঁ-আঁ নয়, বল্ হাঁ হাঁ হাঁ। আর তোর হিসেবের খাতায় লিখে রাখ: "কেহ পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়া পাঁচ টাকা বারো আনার খাইয়া গেল। পরে ক্রমশঃ বাকীটা খাইবে।" আচ্ছা চলি, টা-টা—

অভিলাষ হাঁ—হাঁ বলতে পারলে না—একেবারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। বেচারা অভিলাষ! বল্টুদার পাল্লায় পড়ে ওকে অমন ভাবে ঠকানোটা একদম ঠিক হল না—না খেলেই ভালো হত বল্টুদার সঙ্গে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার পকেটে তো মোটে তিনটে নয়া পয়সা ছাড়া কিছু নেই! যদি কোনো দিন যোগাড় করতে পারি, ওর টাকা নিশ্চয় আমি শোধ করে দেব; এ সব জোচ্চুরিতে আমি নেই!

ভীষণ রাগ হল বল্টুদার ওপর। ট্রামে উঠতে যাচ্ছি—বল্টুদা ঠ্যাং ধরে আমায় টেনে নামাল।

—কোথায় যাচ্ছিস্?

—যাব একবার বলাই ঢ্যাং লেনে।

—ও, আমাদের পাঁচুগোপালের বাড়িতে? তা চল্—চল্। ওর ক্ষেমঙ্করী পিসিমা বেশ ভালো খাওয়ায়।

কী রাক্ষস দেখেছ? এই মাত্র অভিলাষের মাথায় কাঁটাল ভেঙে এতগুলো খেয়ে এসেছে। আবার এক্ষুণি খাই খাই করছে!

বললুম, আজ গিয়ে সুবিধে হবে না। পাঁচুগোপাল ফুটবল খেলতে গিয়ে পা মচকে পড়ে আছে।

* বল্টুদার উৎসাহলাভ *

—পা মচকে পড়ে আছে? আহা, চুক চুক! তা হলে তো ওকে উৎসাহ দেবার জন্তে আরো বেশি করে যাওয়া দরকার। চল্-চল্—

একটা হ্যাঁচকা টানে বল্টুদা আমায় ট্রামে তুলে ফেলল।

পাঁচুগোপালের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়তে ওর ক্ষেমঙ্করী পিসিমা দরজাটা খুলে দিলে। বল্টুদা সঙ্গে সঙ্গে এক মুখ দাঁত বের করে ফেলল। গলেই গেল বলতে গেলে।

—পাঁচু কেমন আছে দেখতে এলুম পিসিমা!

ক্ষেমঙ্করী পিসিমা ভারী খুশি হলেন : আহা বাবা, আয় আয়। বাছা আমার আজ ছ'দিন থেকে মনমরা হয়ে শুয়ে আছে।

—সেই জন্মেই তো এলুম। শরীর খারাপ বলেই তো ওকে ভালো করে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

—তাই দে বাবা। আমি তোদের জন্মে ক'টা তালের বড়া ভেজে আনি।

সত্যিই তালের বড়ার গন্ধে বাড়ি ম-ম করছিল। বল্টুদা মুখটাকে ছুঁচোর মতো ছুঁচোলো করে আমায় চুপি চুপি বললে, দেখ্‌লি তো প্যালা—হুঁ-হু! কেমন প্রেম্‌সে গরম গরম তালের বড়া খাওয়া যাবে। কপাল ভালো থাকলে এমনিই হয়। এখন চল্ দেখি—পেঁচোটা কী করছে।

পায়ে চুন-হলুদ মাখিয়ে পাঁচুগোপাল প্যাঁচার মতো পড়ে আছে। বল্টুদা গিয়ে ধপাৎ করে তার পাশে বসে পড়ল।

—কিরে পেঁচো, কেমন আছিস্?

পাঁচু চিঁ-চিঁ করে বললে, ভীষণ ব্যথা।

—ভীষণ ব্যথা?—বল্টুদা উৎসাহ দিতে লাগল : অমন হয়। ব্যথা হতে হতে শেষে সেপ্‌টিক হয়ে যায়।

পাঁচুগোপাল ভীষণ ঘাবড়ে গেল : মচকানি থেকে সেপ্‌টিক হয়?

—হয় বই কি! অনেক সময় পা কেটে ফেলতে হয়—কত লোকে মরেও যায়।

পাঁচুগোপালের চোখ কপালে চড়ে গেল : অ্যাঁ—আমি তবে মারা যাব নাকি?

উৎসাহ দিয়ে বল্টুদা বলতে লাগল, যেতে পারিস্—কিছু অসম্ভব নয়। তবে মারা না-ও যেতে পারিস্—মানে, মনে জোর থাকলে বেঁচে গেলেও বেঁচে যেতে পারিস। তবে একটা পা কাটা গেলেও ঘাবড়াস্নি। না হয় লাঠি ভর করেই হাঁটবি। আর যদি

ক্ষেমঙ্করী পিসিমার ঝাঁটা আবার নামল বল্টুদার পিঠে।

মারাই যাস্—মনে কর মারাই গেলি—তা হলেও ঘাবড়ে যাস্নি। দেখিস্ পেঁচো—বল্টুদা আরো বেশি উৎসাহ দিতে লাগল: তোর মৃত্যুর পর আমরা কি রকম একখানা শোকসভা—

* বল্টুদার উৎসাহলাভ *

বল্টুদা আর বলতে পারল না—শব্দ হল ঝপাং! 'বাপ—বাপ' বলে বল্টুদা লাফিয়ে উঠল।

ক্ষেমঙ্করী পিসিমার ঝাঁটা আবার নামল বল্টুদার পিঠে। পিসিমা যে কখন ঘরে ঢুকেছে আমরা দেখতে পাইনি।

বিকট রকম দাঁত খিঁচিয়ে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল : তবে রে অলপ্পেয়ে—নচ্ছার, ড্যাকরা, হাড়হাবাতে! আমার পাঁচুর ঠ্যাং কাটা যাবে? আমার পাঁচু মারা যাবে? তার আগে তোরই মরণ ঘনিয়েছে—দেখে নে!

আবার ঝাঁটা নামল : ঝপাং—ঝপাং—

—বাবারে গেছি—গেছি—বলে বল্টুদা ছুটল। পেছনে ছুটল ঝাঁটা হাতে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা। কী আর করা—আমাকেও ছুটতে হল সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধ্যেবেলা গেছি বল্টুদার বাড়িতে। গায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পড়ে আছে বল্টুদা। ঝাঁটার ঘায়ে বল্টুদাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা। উৎসাহ দেবার পালা আমার এবার।

বললুম, কিছু ভেবো না বল্টুদা। ঝাঁটার ঘায়ে যদি সারা গা সেপ্‌টিক হয়ে যায়—যদি তুমি মারাই যাও তা হলেও কিছু চিন্তা কোরো না। অভিলাষের দোকানে তোমার যে চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা পাওনা আছে—সেটা আমিই খেয়ে আসব এখন।

কিন্তু বল্টুদা একদম উৎসাহ পেল না। চেঁচিয়ে আমায় গাল দিতে লাগল : বেরো—বেরো এখান থেকে! উল্লুক—ভল্লুক—শল্লকী—পক্কবিম্ব—অম্লজান কোথাকার—

কী ছোটলোক—দেখেছ?

ঘ্যাংচাদার 'হাহাকার'

ক্যাবলা বললে, বড়দার বন্ধু গোবরবাবু ফিলিমে একটা পার্ট পেয়েছে।

টেনিদা চার পয়সার চীনে বাদাম শেষ করে এখন তার খোলাগুলোর ভেতর খোঁজাখুঁজি করছিল। আশা ছিল দু-একটা শাঁস এখনো লুকিয়ে থাকতে পারে। যখন কিছু পেলে না, তখন খুব বিরক্ত হয়ে একটা খোলাই তুলে নিলে, কড়মড় করে চিবুতে চিবুতে বললে, বারণ কর ক্যাবলা—এক্ষুণি বারণ করে দে।

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে বারণ করব? গোবরবাবুকে?

—আলবাত। নইলে দেখবি তোর গোবরবাবু স্রেফ ঘুঁটে হয়ে গেছে।

—ঘুঁটে হবে কেন? সেই যে কী বলে—মানে স্টার হবে।—আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

—স্টার হবে? আমার ঘ্যাংচাদাও স্টার হতে গিয়েছিল, বুঝলি? এখন নেংচে নেংচে হাঁটে আর সিনেমা হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে আঙুল দিয়ে, চোখ বুজে, খুব মিহি সুরে 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতরো'—এই গানটা গাইতে গাইতে পেরিয়ে যায়।

—বুঝতে পারছি।—হাবুল সেন মাথা নাড়ল: তোমার ঘ্যাংচাদা-রে ফিলিমের লোকেরা মাইর‍্যা ল্যাংড়া কইরা দিছে।

—হঃ, মাইর‍্যা ল্যাংড়া করছে!—টেনিদা ভেংচে বললে, খামোকা বকবক করিস্‌নি হাবুল! যেন এক নম্বরের কুরুবক!

ক্যাবলা বললে, কুরুবক তো ভালোই। এক রকমের ফুল।

—থাম, তুই আর সবজান্তাগিরি করিস্‌নি। কুরুবক যদি ফুল হয় তা হলে পাতি-বকও এক রকমের গোলাপ ফুল! তা হলে পাতিহাঁসও এক রকমের ফজলী আম! তা হলে কাকগুলোও এক রকমের বনলতা!

ক্যাবলা বললে, বা-রে, তুমি ডিক্‌শনারী খুলে ছাখো না!

—শাট্ আপ। ডিক্‌শনারী। আমিই আমার ডিক্‌শনারী। আমি বলছি কুরুবক এক ধরনের বক—খুব খারাপ, খুব বিচ্ছিরি বক। যদি ফের চালিয়াতি করবি তো এক চাঁটিতে তোর দাঁত—

—দাঁতনে পাঠিয়ে দেব।—আমি জুড়ে দিলুম: কিন্তু বকের বকবকানি এখন বন্ধ করো না বাপু। কী ন্যাংচাদার গল্প যেন বলছিলে, তাই বলো।

—অঃ, ফাঁকি দিয়ে গল্প শোনবার ফন্দি? টেনি শর্মাকে অমন 'আন্‌রাইপ চাইল্‌ড' মানে কাঁচা ছেলে পাওনি—বুঝেছ প্যালারাম চন্দর? ন্যাংচাদার রোমহর্ষক কাহিনী যদি শুনতে চাও তা হলে এক্ষুণি পকেট থেকে ঝাল-নুনের শিশিটি বের করো। একটু আগেই লুকিয়ে লুকিয়ে চাটা হচ্ছিল, আমি বুঝি দেখতে পাইনি?

কী ডেঞ্জারাস চোখ—দেখেছ? কত হুঁশিয়ার হয়ে একটু একটু খাচ্ছি—ঠিক দেখে ফেলেছে। সাধে কি ইস্কুলের পণ্ডিত মশাই টেনিদাকে বলতেন, বাবা ভজহরি—তুমি হচ্ছ পয়লা নম্বরের 'সিরিগাল'—মানে ফক্‌স্।

দেখেছে যখন, কেড়েই নেবে। কী আর করি—মানে মানে দিতেই হল শিশিটা।

প্রায় আদ্ধেকটা ঝাল-নুন একবারে চেটে নিয়ে টেনিদা বললে, ন্যাংচাদা—মানে আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই—

হাবুল বললে, চোরে চোরে।

—অ্যাঁ? কী বললি?

—না-না, আমি কিছু কই নাই। কইতাছিলাম একটু জোরে জোরে কও।

—জোরে?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে নাকটাকে আলু-সেদ্ধর মতো করে বললে, আমাকে কি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও পেলি যে, খামোকা হাউ-মাউ করে চ্যাঁচাব? মিথ্যে বাধা দিবি তো এক গাঁট্টায় তোর চাঁদি—

আমি বললুম, চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেব!

—যা বলেছিস!—বলেই টেনিদা আমার মাথায় টকাস্ করে গাঁট্টা মারতে যাচ্ছিল, আমি চট্ করে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালুম।

আমাকে গাঁট্টা মারতে না পেরে ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে, ধ্যেৎ, দরকারের সময়

হাতের কাছে কিচ্ছু পাওয়া যায় না—বোগাস্! মরুক গে—হ্যাংচাদার কথাই বলি। খবর্দার, মাঝখানে ডিস্টার্ব করবি না কেউ।

হ্যাঁ—কী বলছিলুম? আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই হ্যাংচাদার ছিল ভীষণ ফিলিমে নামবার শখ! বায়োস্কোপ দেখে দেখে রাতদিন ওর ভাব লেগেই থাকত। বললে বিশ্বাস করবিনে, বাজারে কাঁচকলা কিনতে গেছে—হঠাৎ ওর ভাব এসে গেল। বললে, 'ওগো তরুণ কদলী! এই নিষ্ঠুর সংসার তোমাকে ঝোলের মধ্যে রান্না করে খায়—তোমার অরুণ হিয়ার করুণ ব্যথা কে বুঝবে!' এই বলে, খুব কায়দা করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে 'ওফ' বলতে যাচ্ছে, এমন সময় কাঁচকলাওলা বললে, 'কোথাকার এঁচোড়ে পাকা ছেলেরে! দিতে হয় কান ধরে এক থাপ্পড়!' হ্যাংচাদা আমার কানে কানে বললে—'অহো—কী নৃশংস মনুষ্য—দেখেছিস্?

এমন ভাবের মাথায় থাকলে কেউ কি আই. এ. পাশ করতে পারে? হ্যাংচাদা সব সাবজেক্টে ফেল করে গেল। আর মেসোমশাই অফিস থেকে ফিরে এসে যা যা বললেন, সে আর তোদের শুনে কাজ নেই। মোদ্দা, অপমানে হ্যাংচাদার সারারাত কান কট্‌কট্‌ করতে লাগল। প্রতিজ্ঞা করল, হয় ফিলিমে নেমে প্রতিভায় চারদিক অন্ধকার করে দেবে—নইলে এ পোড়া প্রাণ আর রাখবে না।

খুব ইচ্ছেশক্তি থাকলে, মানে মনে খুব তেজ এসে গেলে—বুঝলি, অঘটন একটা ঘটেই যায়। হ্যাংচাদা তো মনের দুঃখে সকালবেলা 'দি গ্র্যাণ্ড আবার খাবো রেস্তোরাঁ'য় ঢুকে এক পেয়ালা চা আর ডবল ডিমের মামলেট নিয়ে বসেছে, এমন সময় খুব স্যুট্-টাই হাঁকড়ে এক ছোকরা এসে বসল হ্যাংচাদার টেবিলে। হ্যাংচাদা দেখলে তার কাছে একটা নীলরঙের ফাইল আর তার উপরে খুব বড় বড় করে লেখা—'ইউরেকা ফিলিম কোং'; নবতম অবদান—'হাহাকার'।

হ্যাংচাদার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস্। উত্তেজনায় তার কানের ভেতর যেন তিনটে করে উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগল, নাকের মধ্যে যেন আরশোলারা সুড়সুড়ি দিতে লাগল। তার সামনেই জলজ্যান্ত ফিলিমের লোক বসে—তাতে আবার নবতম অবদান। একেই বলে মেঘ না চাইতে জল। কে বলে কলিযুগে ভগবান নেই?

* ন্যাংচাদার 'হাহাকার' *

ন্যাংচাদা বাগবাজারের ছেলে—তুখোড় চীজ! তিন মিনিটে আলাপ জমিয়ে নিলে। লোকটার নাম চন্দ্রবদন চম্পটী—সে হল 'হাহাকার' ফিলিমের একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। মানে ছবির ডিরেক্‌টারকে সাহায্য করে আর কি।

হাবুল বললে, সহকারী পরিচালক।

—চোপরাও! টেনিদা হাবুলকে এক বাঘা ধমক লাগিয়ে বলল, চন্দ্রবদনকে ন্যাংচাদা ভজিয়ে ফেললে। তার বদনে দুটো ডবল ডিমের মাম্‌লেট, চারটে টোস্ট আর তিন কাপ চা ঘুষ দিয়ে—শেষে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল ন্যাংচাদা। ওঠবার সময় চন্দ্রবদন বললে, এত করে বলছেন যখন—বেশ, আপনাকে আমি ফিলিমে চান্স দেব। কাল বেলা দশটার সময় যাবেন বরানগরের ইউরেকা ফিলিমে—নামিয়ে দেব জনতার দৃশ্যে।

হাত কচলাতে কচলাতে ন্যাংচাদা বললে, স্টুডিওটা কোথায় স্যার?

চন্দ্রবদন জায়গাটা বাতলে দিলে। বললে, দেখলেই চিনতে পারবেন। উঁচু পাঁচিল—বাইরে লেখা রয়েছে 'ইউরেকা ফিলিম কোং'। আচ্ছা আসি এখন, ভেরি বিজি, টা-টা—

হাত নেড়ে চন্দ্রবদন তড়াক করে একটা চলতি বাসে উঠে চলে গেল।

সেদিন রাত্তিরে তো ন্যাংচাদার আর ঘুম হয় না। বার বার বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জনতার দৃশ্যে পার্ট করছে। মানে কখনো স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে—কখনো জয়ধ্বনি করছে, কখনো অট্টহাসি হাসছে। অবিশ্যি হাসি আর জয়ধ্বনিটা নিঃশব্দেই হচ্ছে—পাশের ঘরেই আবার মেসোমশাই ঘুমোন কিনা!

সারারাত ধরে জনতার দৃশ্য সড়গড় করে নিয়ে ন্যাংচাদা সকাল ন'টার আগেই সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসে চেপে বসল। তারপর জায়গাটা আঁচ করে নেমে পড়ল বাস থেকে।

খানিকটা হাঁটতেই—আরে, ওই তো উঁচু পাঁচিল। ওইটেই ইউরেকা ফিলিম।

গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে গেল ন্যাংচাদা। বাইরে একটা মস্ত লোহার গেট—ভেতর থেকে বন্ধ। তার ওপরে বোর্ডে কী একটা নাম লেখা আছে—কিন্তু লতার ঝাড়ে নামটা পড়া যাচ্ছে না—দেখা যাচ্ছে কেবল তিনটে হরফ—এল. ইউ. এম.।

এল-ইউ-এম! লাম! মানে ফিলাম। তার মানেই ফিলিম।

ক্যাবলা আপত্তি করলে, লাম। লাম কেন হবে? এফ-আই-এল্-এম্—ফিল্ম্!

টেনিদা রেগে-মেগে চিৎকার করে উঠল, সায়লেন্স! আবার কুরুবকের মতো বক-বক করছিস্? এই রইল গল্প—আমি চললুম।
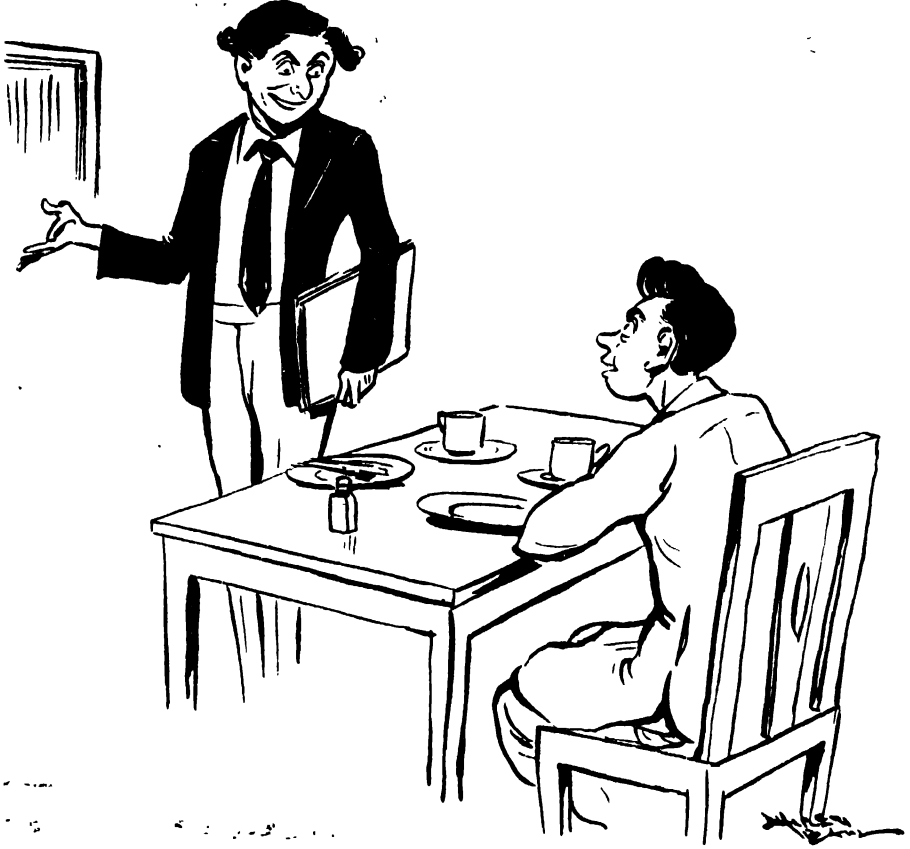
যাবেন বরানগরের ইউরেকা ফিলিমে—নামিয়ে দেব জনতার দৃশ্যে

প্রায় চলেই যাচ্ছিল, আমরা টেনে-টুনে টেনিদাকে বসালুম।

হাবুল বললে, ছাইড়্যা দাও ক্যাবলার কথা—চ্যাংড়া!

* ন্যাংচাদার হাহাকার *

—চ্যাংড়া! ফের ডিস্টার্ব করলে ট্যাংরা মাছ বানিয়ে দেব বলে রাখছি, হুঁঃ!

লোহার গেট বন্ধ দেখে ন্যাংচাদা গোড়াতে তো খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, চন্দ্র-বদন নির্ঘাত গুলপট্টি দিয়ে দিব্যি পরস্মৈপদী খেয়ে-দেয়ে সটকান দিয়েছে। তারপর ভাবলে অন্য দিকেও তো দরজা থাকতে পারে। দেখা যাক।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুর-ঘুর করছে—গেট-ফেট তো দেখা যাচ্ছে না। খুব দমে গেছে, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ মোটা গলায় কে বললে, হু আর ইউ?

ন্যাংচাদা তাকিয়ে দেখলে পাঁচিলের ভেতর একটা ছোট ফুটো। তার মধ্যে কার দুটো জ্বল-জ্বলে চোখ আর একজোড়া ধুমসো গোঁফ দেখা যাচ্ছে। সেই গোঁফের তলা থেকে আবার আওয়াজ এল : হু আর ইউ?

ন্যাংচাদা বললে, আমি—মানে আমাকে চন্দ্রবদনবাবু ফিলিমে পার্ট করতে ডেকে-ছিলেন। এইটেই তো ইউরেকা ফিলিম?

—ইউরেকা ফিলিম?—গোঁফের তলা থেকে বিচ্ছিরি দাঁত বের করে কেমন খ্যাঁক-খেঁকিয়ে হাসল লোকটা। তারপর বললে, আলবত ইউরেকা ফিলিম। পার্ট করবে? ভেতরে চলে এসো।

—গেট যে বন্ধ। ঢুকব কী করে?

—পাঁচিল টপকে এসো। ফিলিমে নামবে আর পাঁচিল টপকাতে পারবে না?

ন্যাংচাদা ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক। ফিলিমের কারবারই আলাদা। দ্যাখ না—সাঁ করে লোকে নল বেয়ে চারতলায় উঠে পড়ছে, ঝপাং করে পাঁচতলার থেকে নিচে লাফিয়ে নামছে—একটা চলতি ট্রেন থেকে লাফিয়ে আর একটা ট্রেনে চলে যাচ্ছে। এসব না করতে পারলে ফিলিমে নামাবেই বা কেন?

ন্যাংচাদা বুঝতে পারল, এখানে পাঁচিল টপকে ভেতরে যাওয়াই নিয়ম, ওইটেই ফিলিমে পার্ট করবার প্রথম পরীক্ষা।

ন্যাংচাদা কী আর করে? দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। দু' পা ওঠে—আর সড়াক করে পিছলে পড়ে যায়। শখের সিল্কের পাঞ্জাবী ছিঁড়ল, গায়ের নুনছাল উঠে গেল, ঠিক নাকের ডগায় কুট্টুস করে একটা কাঠ-পিঁপড়ে

কামড়ে দিলে। ওদিকে ভেতরে বোধ হয় আরো কিছু লোক জড়ো হয়েছে—তারা সমানে বলছে—হেঁইয়ো জোয়ান—আর একটু—আর একটু—

প্রাণ যায় যায়—কিন্তু হ্যাংচাদা হার মানবার পাত্তর নয়। একে বাগবাজারের ছেলে, তায় জনতার দৃশ্যে পার্ট করতে এসেছে। আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে ঠিক উঠে গেল পাঁচিলের উপর। বসে একটু দম নিতে যাচ্ছে, অমনি তলা থেকে কারা বললে, আয়রে আয়—চলে আয় দাদা—আয়রে আমার কুমড়ো-পটাশ—

আর বলেই হ্যাংচাদার পা ধরে হ্যাঁচকা টান। হ্যাংচাদা একেবারে ধপাস্ করে নিচে পড়ল। কুমড়ো-পটাশের মতোই।

কোমরে বেজায় চোট লেগেছিল, 'বাপ-রে মা-রে' বলতে বলতে হ্যাংচাদা উঠে দাঁড়াল। দেখলে পাঁচিলে ঘেরা মস্ত জায়গাটা—সামনে খানিক মাঠের মতো—একটু দূরে একটা বড় বাড়ি, পাশেই একটা ছোট ডোবা—তাতে জল নেই, খানিক কাদা। আর তার সামনে পাঁচ-সাত জন লোক দাঁড়িয়ে নানা রকম মুখভঙ্গী করছে।

একজন একটা হুঁকো টানছে—তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছুটি নেই। আর একজনের ছেঁড়া সাহেবী পোশাক—কিন্তু টুপির বদলে মাথায় একটা ভাঙা বালতি বসানো। একজনের গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা। আর একজন মুখে লম্বা লম্বা গোঁফদাড়ি—সমানে চেঁচিয়ে বলছে : 'কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়।' বলেই সে এমন ভাবে ঘ্যাঁক করে দৌড়ে এল যে, হ্যাংচাদাকে কামড়ে দেয় আর কী!

সেই সাহেবী-পোশাক-পরা লোকটা ধাঁ করে রদ্দা মেরে "কুকুর আসিয়া এ কামড়"-কে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর বললে, বন্ধুগণ, আমাদের নতুন অভিনেতা এসে গেছেন। বেশ চেহারাটি। এঁকেই হিরো করা যাক—কেমন?

সকলে চেঁচিয়ে বললে, হিরো হিরো—আলবত হিরো।

হ্যাংচাদা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিরো শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। বুঝ সিনেমায় তো নানা রকম পার্ট করতে হয়—তাই ওরা সব ওই রকম সেজেছে, যাকে ব 'মেক আপ'। তারপর তাকেই হিরো করতে চায়। হ্যাংচাদা নাক আর কোমরের ব্য ভুলে একেবারে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হাসল। বললে, তা আজ্ঞে হিরোর পার্টও আমি করত

পারব—পাড়ার থিয়েটারে দু' বার আমি হনুমান সেজেছিলুম। কিন্তু চন্দ্রবদনবাবু কোথায় ?

সেই জুতোর-মালা-পরা লোকটা বললে, চন্দ্রবদন শ্বশুরবাড়ি গেছে—জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে। আমি হচ্ছি সূর্যবদন—ডিরেক্টার।

বালতি মাথায় লোকটা তাকে ধাঁই করে চাঁটি দিল: ইউ ব্লাডি নিগার! তুই ডিরেক্টার কিরে ? তুই তো একটা হুঁকোবর্দার। আমি হচ্ছি ডিরেক্টার—আমার নাম হচ্ছে তারাবদন।

সূর্যবদন চাঁটি খেয়ে বিড়-বিড় করতে লাগল:

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
আজি কি সুন্দর নিশি পূর্ণিমা উদয়
একা ননী পাড়ে ছানা আমগাছে চড়ে
মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার—"

তারাবদন ধমক দিয়ে বললে, চুপ! এখন রিহার্সেল হবে। তারপর হিরোবাবু—তোমার নাম কি ?

ন্যাংচাদা বললে, আমার ভালোনাম বিষ্ণুচরণ—ডাকনাম ন্যাংচা।

—ন্যাংচা! আহা—খাসা নাম! শুনলেই খিদে পায়।—তারপর ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, জানো—আমার ডাকনাম চমচম!

ন্যাংচাদা বলতে যাচ্ছে, তাই নাকি—হঠাৎ তারাবদন—মানে চমচম চেঁচিয়ে উঠল: কোয়ায়েট্! সব চুপ। রিহার্সেল হবে। মিস্টার ন্যাংচা—

ন্যাংচাদা বললে, আজ্ঞে ?

—এক পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা তাই করলে।

—এবার দু'পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা ভেবড়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে দু' পা তুলে কি—

বলতেই তারাবদন চটাস্ করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে ন্যাংচাদার গালে। বললে,

রে বর্বর, স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ! যা বলছি তাই করো। ফিলিমে পার্ট করতে এসেছ—দু'পা তুলে দাঁড়াতে পারবে না! এয়ার্কী নাকি?

চাঁটি খেয়ে হ্যাংচাদার তো মাথা ঘুরে গেছে। কাঁউ-মাউ করে দু'পা তুলে দাঁড়াতে গেল। আর যেই দু'পা তুলতে গেল অমনি ধপাৎ করে পড়ে গেল মাটিতে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল: শেম—শেম—পড়ে গেলি! ফাই—ফাই!

হ্যাংচাদা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ফিল্‌মে নামতে গেলে নিশ্চয় দু'পা তুলে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু কী করে যে সেটা পারা যায় কিছুতেই ভেবে পেল না।

তারাবদন হ্যাংচাদার ঝুল্‌পি ধরে এমন হ্যাঁচকা মারল যে, তড়বড়িয়ে লাফিয়ে উঠতে হল বেচারীকে।

তারপর তারাবদন বললে, এবার গান করো।

—কী গান গাইব?

—যে গান খুশি। বেশ উপদেশপূর্ণ গান।

হ্যাংচাদা একেবারে গাইতে পারে না—বুঝলি? মানে আমাদের প্যালার চাইতেও যাচ্ছেতাই গান গায়—একবার রাস্তায় যেতে যেতে এমন তান ছেড়েছিল যে, শুনে একটা কাবলীওলা আচম্‌কা আঁতকে উঠে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিরো হওয়ার আনন্দে সেই হ্যাংচাদাই ভীমসেনী গলায় গান ধরল:

'ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিল এক মাসী—
ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসী সর্বনাশী—'

এতটুকু কেবল গেয়েছে—হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠল: স্টপ—স্টপ—আর গান না।

তারাবদন বললে, না—আর গান না! এবার নাচো—

—নাচব?

—নিশ্চয় নাচবে।

—আমি তো নাচতে জানিনে।

* ন্যাংচাদার হাহাকার *

—নাচতে জানো না - হিরো হতে এসেছ ? মামার বাড়ির আবদার পেয়েছ—না ?—বলেই কড়াং করে ন্যাংচাদার ঝুল্‌পিতে আর এক টান।

—গেলুম গেলুম—বলে ন্যাংচাদা নাচতে লাগল। মানে ঠিক নাচ নয়—লাফাতে লাগল ব্যথার চোটে।

সকলে বললে, এন্‌কোর—এন্‌কোর !

যেই এন্‌কোর বলা—অম্‌নি তারাবদন আর একটা পেল্লায় টান দিয়েছে ন্যাংচাদার ঝুল্‌পিতে ! 'পিসিমা গো গেছি'—বলে ন্যাংচাদা এবার এমন নাচতে লাগল যে তার কাছে কোথায় লাগে তোদের উদয়শংকর !

তারাবদন বললে, রাইট—ও-কে—কাট্ !

কাট্ ! কাকে কাট্‌বে ? ন্যাংচাদা ভয় পেয়ে যেই থমকে গেছে অমনি তারাবদন বললে, এবার তা হলে সন্তরণের দৃশ্য। কী বলো বন্ধুগণ ?

সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে বললে, ঠিক—এবারে সন্তরণের দৃশ্য !

ন্যাংচাদা 'আরে আরে—করছ কি—' বলতে বলতে সবাই ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলল। তারপর চক্ষের পলকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে সেই ডোবাটার ভেতরে !

কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠতে যাচ্ছে, সবাই আবার ঠেলে ডোবার মধ্যে ফেলে দিলে। বলতে লাগল : সন্তরণ—সন্তরণ !

আর সন্তরণ ! ন্যাংচাদার তখন প্রাণ যাওয়ার জো। সারা গা—জামাকাপড় কাদায় একাকার—নাকে মুখে দুর্গন্ধ পচা পাঁক ঢুকে গেছে, আর বিছুটির মতো সে কি জ্বলুনি ! ন্যাংচাদা যেমনি উঠতে চায় অমনি সবাই তক্ষুণি তাকে ডোবায় ফেলে দেয়। আর চ্যাঁচাতে থাকে : সন্তরণ—সন্তরণ—

শেষে ন্যাংচাদা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করতে লাগল—মানে 'হাহাকার' ফিলিমে পার্ট করতে এসেছিল কিনা : বাঁচাও—বাঁচাও—আমাকে মেরে ফেললে—আমি আর ফিলিমে পার্ট করব না—কক্ষনো না—

প্রাণ যখন যাবার দাখিল তখন কোত্থেকে তিন-চারজন খাকী-শার্ট-প্যান্ট-পরা লোক লাঠি হাতে দৌড়ে এল সেদিকে। আর তক্ষুণি তারাবদনের দল একেবারে হাওয়া !

ন্যাংচাদার তখন প্রায় নাভিশ্বাস। খাকী-পরা লোকগুলো তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে কিছুক্ষণ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। শেষে বললে, ক্যা তাজ্জব! ই নৌতুন পাগলা ফের্ কাঁহাসে আসলো?

কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠতে যাচ্ছে,—সবাই বলতে লাগল : সন্তরণ—সন্তরণ!

ব্যাপার বুঝলি? আরে—ওটা মোটেই ফিলিম স্টুডিয়ো নয়; 'লাম'—মানে লুনাটিক অ্যাসাইলাম—অর্থাৎ কিনা পাগলা গারদ। উঁচু পাচিল আর 'লাম' দেখেই, ন্যাংচাদার

বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। সাধে কি আর আই. এ.-তে সব সাব্জেক্টে ফেল হয়! ফিলিম স্টুডিয়োটা কাছাকাছি আর কোথাও ছিল হয়তো।

ন্যাংচাদা কী করে বাড়ি ফিরল সে আর শুনে কাজ নেই। কিন্তু সেই থেকে আজো ন্যাংচাদা নেংচে নেংচে হাঁটে—আর সিনেমা হাউসের সামনে এলেই চোখ বুজে করুণ গলায় গান গাইতে থাকে: 'দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু—'

টেনিদা থামল। আমার ঝাল-নুনের শিশি ততক্ষণে সাফ।

হাত চাটতে চাটতে বললে, তাই বলছিলুম, তোর গোবরবাবুকে এক্ষুণি বারণ করে দে। আরে, আসলে ফিলিম স্টুডিয়োগুলোও এমনি পাগলা গারদ—গোবরবাবুকে স্রেফ ঘুঁটেচন্দর বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

গজকেষ্টবাবুর হাসি

আমাদের পাড়ার গজকেষ্টবাবুকে নিয়ে ভারী মুশকিলেই পড়া গেছে।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—ভদ্রলোক হাসতে ভালোবাসেন। আর সে হাসি সাংঘাতিক।

কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারছ না? ভাবছ, হাসতে ভালোবাসেন—তাতে আর ক্ষতিটা কী!

সাংঘাতিক হাসেন—তাতেই বা কী আসে যায়? বরং ভয়ঙ্কর গোমড়ামুখো লোকের চাইতে হো-হো-হা-হা করে হাসিয়ে লোক তো ঢের ভালো।

হুঁ-হুঁ, মোটেই তা নয়। গজকেষ্টবাবু তো শুধু হাসেনই না—একবার যদি তাঁর হাসি পায়, তা হলে তিনি মারাত্মক হয়ে ওঠেন। তখন আশ-পাশের লোককে তিনি কাঁদিয়ে ছাড়েন। তাই যক্ষুণি তিনি হাসবার জন্য হাঁ করেন, তক্ষুণি আমরা 'বাপরে-মা-রে' বলে যে যেদিকে পারি ছুটে পালাই।

তা হলে আর একটু খুলেই বলি।

এই তো সেদিন আমাদের পটলডাঙার নকুড়বাবু কাঁধে একটা মস্ত চালকুমড়ো নিয়ে যাচ্ছেন। নকুড়বাবুর মাথা জোড়া চকচকে টাক—একটি চুল পর্যন্ত কোথাও নেই। তাই দেখে হাবুল সেন আমাকে বলছিল, মজাটা ছাখছস্ প্যালা? নকুড়বাবুর মাথা আর চালকুমড়াটা ছাখতে ঠিক একই রকম। মনে হইত্যাছে নকুড়বাবুর কান্ধের উপর দুইটা মাথা উঠছে!

ব্যাস্—আর যায় কোথায়!

পাশ দিয়ে গজকেষ্টবাবু যাচ্ছিলেন। হাবলার কথা শুনেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। আকাশ-জোড়া হাঁ করে ত্রিশটা দাঁত (মানে, দুটো পড়ে গেছে) বার করে হাউ-হাউ শব্দে হাসতে হাসতে হঠাৎ জাপটে ধরলেন হাবুলকে। তারপরেই হাবুলের কাঁধের ওপর খ্যাঁক্ করে এক কামড়!

গজকেষ্টবাবুর হাসি

--খাইছে—খাইয়া ফেল্ছে—কম্মো সার্ছে—বলে তো হাবুলের তারস্বর চীৎকার।

আমরা সকলে মিলে ছাড়াতে গেলুম--কিন্তু ছাড়ানো কি সোজা! অনেক কষ্টে হাবুলকে বের করে আনা গেল, কিন্তু তার মধ্যেই গজকেষ্টবাবু ঘ্যাঁচ্ করে আমার বাঁ কানটা কামড়ে দিলেন আর ক্যাবলাকে দিলেন একটা ঘুষি বসিয়ে।

মানে, হাসি পেলে ওঁর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে যাকে সামনে পান আঁচড়ে-কামড়ে, কিল-ঘুষি মেরে অস্থির করে তোলেন।

গত বছরের ব্যাপারটাই শোনো। সরস্বতীপুজোর সময় মাইকে বাজানোর জন্যে কতগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড আনা হয়েছে। তাই থেকে সবে একটা হাসির গান বাজাতে শুরু করেছে আমাদের টেনিদা, আর তৎক্ষণাৎ--

বাজারের ভেতরে তাড়া খেয়ে গোরু যেমন করে দৌড়োতে থাকে তেমনিভাবে ছুটতে ছুটতে একে ধাক্কা দিয়ে, তাকে মাড়িয়ে গজকেষ্টবাবু এসে হাজির। তাই দেখে রেকর্ড-ফেকর্ড ফেলে টেনিদা তো এক লাফে উধাও। তখন গজকেষ্টবাবু করলেন কি—হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন, তারপর উঠে একসঙ্গে খান বারো রেকর্ডই তুলে নিয়ে মারলেন এক আছাড়! আর দেখতে হল না—বারোখানা রেকর্ডেরই বারোটা বেজে গেল! তা হলেই বোঝো কী ভয়ঙ্কর ওঁর হাসি!

এমনিতে কিন্তু খাসা মানুষ। পুজোর চাঁদা চাই? আচ্ছা, তক্ষুণি দিলেন পঞ্চাশটা টাকা। পাড়ার কারো আপদ-বিপদ হলে গজকেষ্টবাবু অমনি সেখানে হাজির। কোনো বাড়ির রুগীকে রাত ছুটোর সময় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে? গজকেষ্টবাবু নিজের মোটর গাড়ি নিয়ে তক্ষুণি চলে আসবেন। এমন লোকের ওপর তো রাগও করা যায় না!

ওঁর মোটর গাড়ির কথাই ধরো না। বললেই তোমাকে গাড়িতে চাপাবেন, যেখানে যেতে চাও পৌঁছে দেবেন। কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে যদি ওঁর হাসি পায় আর দেখতে হবে না। তখন তুমি পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা সন্দেহ। এই তো দু'মাস আগে আমি আর আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা মেট্রো সিনেমা থেকে বায়োস্কোপ দেখে বেরিয়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি—গজকেষ্টবাবু এসে ঘস করে আমাদের দেখে গাড়ি থামালেন।

—বাড়ি ফিরবে বুঝি ?

আমরা বললুম, আজ্ঞে হাঁ ?

—তা হলে উঠে পড়ো গাড়িতে।

আমরা দারুণ খুশি হয়ে উঠেছি ওঁর গাড়িতে। দিব্যি মজাসে যাচ্ছি, হঠাৎ ফুচুদাই গোলমাল করে ফেলল। সিনেমার শোনা একটা হাসির গান বিচ্ছিরি বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল—

এক ছিল শৌখিন ব্যাং

সরু সরু মোজাপরা ঠ্যাং

সাবান মাখত আর গাইত পুকুরঘাটে বসে

ট্রালা-লা-লা-লা-লা-লা-লা-গ্যাং—

আমি আঁতকে উঠে ফুচুদাকে বলতে গেছি—'আরে করছ কী—সর্বনাশ হয়ে যাবে,' কিন্তু তার আগেই যা হওয়ার হয়ে গেছে। বিকট আওয়াজ করে হেসে উঠেছেন গজকেষ্ট-বাবু। এক প্যাকেট মাখন আর দুটো পাঁউরুটি কিনেছিলেন, সেগুলো ছুঁড়ে দিয়েছেন রাস্তায়, একজন দাড়িওলা ভদ্রলোকের মুখে গিয়ে লেগেছে মাখনের প্যাকেট—দাড়িতে মাখন মাখামাখি, রুটির ঘা খেয়ে একজন উড়িয়া চাকর 'বাপ্পো-বাপ্পো' বলে চেঁচিয়ে উঠছে আর—

আর মোটর গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে পা দুটো সামনের উইণ্ডস্ক্রীনে তুলে দিয়ে দু হাত ছুঁড়ে গজকেষ্টবাবু হাসছেন হা-হা-হা-হাউ হাউ—

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা মেরেছে সামনের ল্যাম্প-পোস্টে।

ভাগ্যিস আস্তে যাচ্ছিল গাড়ি, তাই মাথায় পেটে বেদম ঝাঁকুনি খেয়েই আমরা এ যাত্রা পার পেয়ে গেলুম। স্পীডে চললে আর দেখতে হত না—ব্যাস্, ওইখানেই খেলা খতম। একদম হালুয়া হয়ে যেতুম আমরা।

তারপর থেকে আমরা ওঁর মোটর গাড়ির ত্রিসীমানাতে নেই। সর্বনাশ! ওঁর গাড়িতে চড়া মানেই মহাযাত্রার রাস্তায় পা বাড়ানো। কখন কী বলে ফেলব, হাসতে হাসতে উনি স্টিয়ারিং ছেড়ে দেবেন—আর তারপরে! কী মুশকিলের ব্যাপার ছাখো দেখি।

ক্যাবলার খুড়তুতো ভাই মেন্টুর মুখে ভাত। আমরা খেতে গেছি। জোর

খাওয়া-দাওয়া চলছে। বেগুনভাজা, ঘ্যাঁট্, শাক-চচ্চড়ি, মুগের ডাল, ফ্রাই আর মাছের কালিয়া এসব খাওয়ার পর এসেছে মাংস-পোলাও। বেশ জমিয়ে খাচ্ছি--গজকেষ্টবাবু সবে খান বারো মাছ খেয়ে মাংসের দিকে মন দিয়েছেন এমন সময়—কে একজন আর একজনকে বললে, এই, অত মাংস খাসনি। বেশি পাঁঠার মাংস খেয়ে শেষে পাঁঠা হয়ে যাবি, আর ব্যা-ব্যা করে ডাকবি।

এমনিতেই প্রাণ ভরে খেতে খেতে গজকেষ্টবাবুর মেজাজ বেশ খোশ হয়ে ছিল, তার উপর কথাটা যেই শুনেছেন : ব্যাস্!

তড়াক করে পাতা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। কথাটা যে বলেছিল এক লাথি দিয়ে তার পাতাটা উল্‌টে দিলেন, জলের গেলাসটা আর এক ভদ্রলোকের কোলের উপর গিয়ে পড়ল। সে ভদ্রলোক এঁ-এঁ-এঁ করে উঠতে গজকেষ্টবাবু তার হাঁটুটা খ্যাঁক করে কামড়ে দিলেন, তারপর—

হো হো হো হিয়া হিয়া করে হাসতে হাসতে গিয়ে গজকেষ্টবাবু চেপে ধরলেন আমাদের বল্টুদাকে। বল্টুদা মাংস পরিবেশন করছিল। গজকেষ্টবাবু করলেন কি, মাংসের বাল্‌তিটা কেড়ে নিয়ে সোজা ঢেলে দিলেন বল্টুদার মাথায়। বল্টুদা 'ইঁয়া ইঁয়া এঁঃ এঁঃ' করে লাফাতে লাগল, গা আর গেঞ্জী বেয়ে পড়তে লাগল মাংসের ঝোল, আর সব মিলে বল্টুদাকে ঠিক একটা ঝোল-মাখানো গ্রেভি চপের মতো মনে হল। মানে একটা গ্রেভি চপ লাফাতে থাকলে যেরকম দেখায় সেই রকম হল আর কি ব্যাপারটা।

কী যে বিচ্ছিরি হল বুঝতেই পারছ—যাকে বলে দক্ষযজ্ঞ! এদিকটায় যারা বসেছিল তাদের তো খাওয়াই পণ্ড হয়ে গেল। নেহাৎ গজকেষ্টবাবু বলেই পার পেলেন আর কোনো লোক হলে সবাই মিলে পিটিয়ে পোস্ত-চচ্চড়ি বানিয়ে দিত। তাই বলছিলুম গজকেষ্টবাবু হাসলেই তোমার কান্নার পালা। কাছাকাছি যদি থাকো, একেবারে দফা নিকেশ করে ছেড়ে দেবেন।

আমরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। গজকেষ্টবাবুকে দূরে আসতে দেখলেই সব্বাই একেবারে রামগরুড়ের ছানা সেজে বসে যাই— এমন মুখ করে থাকি যে, এক্ষুণি বুঝি কেঁদে ফেলব।

সেদিন তো গজকেষ্টবাবু জিজ্ঞেসই করে বসলেন, কিহে, তোমরা যে সব হাঁড়ির মতো মুখ করে আছো? হয়েছে কি?

হাবুল সেন পট্ করে বলে ফেলল, আমরা মনে বড় দুঃখ পাইছি।

বল্টুদাকে ঠিক একটা ঝোল-মাখানো গ্রেভি চপের মতো মনে হল

—কেন, দুঃখুটা কিসের?

—আহা মইর‍্যা গেলেন, আহা বড় ভালো লোক আছিলেন—

—কে মারা গেলেন? গজকেষ্টবাবু জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলেন: কে ভালো লোক ছিলেন?

হাবুল তো দারুণ প্যাঁচে পড়ে গেল! কে মারা গেল সেটা ও একেবারেই

ভাবেনি। হাবুলকে মাথা চুলকোতে দেখে ক্যাবলা বললে, ইয়ে মানে—গদাধরবাবু, খুরুটের গদাধরবাবু। তিনিই মারা গেছেন কালকে।

আন্দাজী একটা যা-খুশি বলে দিয়েছিল ক্যাবলা, কিন্তু গজকেষ্টবাবুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া শক্ত। গজকেষ্টবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, খুরুটের গদাধরবাবু? মানে গদাধর পাল? আরে সে মারা যাবে কেন? একটু আগেই তো শালকেতে তার সঙ্গে আমার দেখা হল।

তখন আমি বললুম, না—না গদাধর পাল নয়, গদাধর পাঁড়ে। খুরুটে নয়—খুদা রোডে থাকত। সে-ই মারা গেছে। তার জন্যেই আমরা শোকে কাতর হয়ে—

গজকেষ্টবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তক্ষুণি একটা কাণ্ড হল।

সামনেই রাস্তা দিয়ে প্রাণধনবাবু গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে আপন মনে চলছিলেন। আচমকা একটা কলার খোসায় তাঁর পা পিছলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধড়াম্ করে এক আছাড়।

দেখেই আকাশ কাঁপিয়ে, আমার পেটের পালাজ্বরের পিলেটাকে চমকে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর অট্টহাসি হাসলেন গজকেষ্টবাবু আর তীরের মতো ছুটে গেলেন প্রাণধনের দিকে।

আমরাও 'গেল - গেল' বলে ছুটলুম। প্রাণধনবাবু আছাড় খেয়েছেন বলে নয়— এইবার গজকেষ্টর হাতে তিনি পড়ে যাবেন।

যা ভেবেছি, ঠিক তাই।

প্রাণধনবাবু সামলে নিয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন, অমনি গজকেষ্টবাবু গিয়ে ক্যাঁক্ করে ধরেছেন তাঁকে। হ্যাঃ—হ্যাঃ করে হাসতে হাসতে প্রথমেই প্রাণধনের নাকটা কামড়ে দিলেন।

প্রাণধন 'ই—ই—ইরে বাঁপ্'—বলে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠতেই গজকেষ্টবাবু দমাদম ঘুষি চালাতে লাগলেন তাঁর ওপর। প্রায় পঞ্চাশজন লোক জড়ো হয়ে যখন তাঁকে গজকেষ্টবাবুর খপ্পর থেকে বের করে আনল, তখন প্রাণধন প্রায় অজ্ঞান। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে—গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে।

সকলে গজকেষ্টবাবুকে যাচ্ছেতাই বলে বকতে লাগল।

—ছিঃ ছিঃ মশাই—আপনি কি খুনে নাকি? এখুনি যে মেরে ফেলছিলেন ভদ্রলোককে।

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন গজকেষ্টবাবু। নিজের মোটরে চাপিয়ে প্রাণধনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ঘণ্টা খানেক পরে নাকে মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে প্রাণধন বেরুলেন হাসপাতাল থেকে। আর তাঁর ফ্যাটা-বাঁধা সেই অদ্ভুত চেহারা দেখেই গজকেষ্টবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। খি—খি—খিক্-খিক্ বলে একটা বিদ্‌কুটে আওয়াজ তুলে ছুটলেন প্রাণধনের দিকে। একেবারে সোজা চার্জ।

কিন্তু প্রাণধনও এবার হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন। তিনি 'ওরে বাবা' বলে একখানা পেল্লায় লাফ মারলেন, তার পরে 'সারলে রে—' বলে রাম চীৎকার তুলে এমন দৌড় লাগালেন যে, তার কাছে অলিম্পিক রেকর্ড কোথায় লাগে!

গজকেষ্টবাবু প্রাণধনকে ধরতে পারলেন না—তার বদলে একটা পাহারাওলাকে ধরতে গেলেন।

'আরে বাপ—ই ক্যা হৈ'—বলে পাহারাওলা পালাতে গিয়ে একটা ষাঁড়ের ঘাড়ে উল্‌টে পড়ল। গজকেষ্টবাবু ষাঁড়টাকেই কামড়াতে যাচ্ছিলেন—সেই সময় আমরা সবাই মিলে ওঁকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসে গাড়িতে তুললুম। তারই ভেতর গজকেষ্টবাবু খ্যাঁচ করে আমার ডান কানটা কামড়ে দিলেন!

ভাগ্যিস্ আমাদের মধ্যে হাবুল মোটর চালাতে জানে। সে-ই তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে এল ওখান থেকে। নইলে গজকেষ্টবাবুকে ঠিক পুলিসে ধরে নিয়ে যেত।

* * * *

কিন্তু এই ক'দিন হল গজকেষ্টবাবুর হাসি একদম বন্ধ হয়ে গেছে। গজকেষ্টবাবু আর হাসেন না—হাসির কথা শুনলে আর তেড়ে গিয়ে কাউকে আক্রমণ করেন না। বরং কোনো হাসির কথা বললে ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়—যেন বাঘ দেখেছেন, এম্‌নিভাবে ছুটে পালান সেখান থেকে।

এই অঘটন ঘটিয়েছেন প্রাণধনবাবু।

হ্যাঁ—প্রাণধনই ঘটিয়েছেন। একেবারে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছেন যাকে বলে।

* গজকেষ্টবাবুর হাসি *

প্রাণধনকে আমরা সবাই নিরীহ ভালো মানুষ বলেই জানতুম। তাঁর মনে যে এত তেজ, এমন প্রতিহিংসা আছে তা কে জানত।

সেদিন দেখি রাস্তার মাথায় প্রাণধনবাবু তাঁর ভাগনে কানাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কানাই দারুণ পালোয়ান—গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তি লড়ে। দু'জনে মিলে ফিস্-ফিস্ করে আলাপ চলছে। প্রাণধনের হাতে দেখলুম লেবেল-মারা একটা শিশি। তার গায়ে লেখা কুইনিন মিক্শ্চার।

জিজ্ঞেস করলুম, হাতে কুইনিন মিক্শ্চার কেন প্রাণধনবাবু? কারো অসুখ নাকি?

প্রাণধনবাবু ঠোঁটে আঙুল দিলেন। আমি দেখলুম দুলতে দুলতে গজকেষ্টবাবু আসছেন।

প্রাণধনবাবুর মতলবটা কী বোঝবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময় কানাই গলা ছেড়ে গর্দভ রাগিণীতে গান ধরল :

'এক যে ছিল গাধা
পেণ্টুলুন কিনবে বলে
আদায় করত চাঁদা—'

যেই গেয়েছে - মাঝপথে অমনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন গজকেষ্টবাবু। কানাই আরো গলা চড়িয়ে গাইতে লাগল :

'বলত সেই গাধা :
চার আনা করে সবাই আমায়
দিয়ে যাবেন দাদা— '

—হৌ-হৌ-হৌ-হোয়া বলে গগনভেদী অট্টহাসি হাসলেন গজকেষ্টবাবু—তার পরেই দমদম বুলেটের মতো তেড়ে এলেন কানাইয়ের দিকে।

কানাইও তৈরিই ছিল। 'হা-রে-রে-রে-রে' বলে হাঁক ছেড়ে সে তক্ষুণি ধপাক্ করে গজকেষ্টবাবুকে ধরে ফেলল, তারপর পাকা কুস্তিগীরের মতো একখানা ধোপিয়া পাটের প্যাঁচ লাগিয়ে সোজা ফেলে দিলে রাস্তার ওপর। গজকেষ্টবাবুকে একেবারে চিৎ করে ফেলে কানাই তাঁর ওপর চেপে বসল।

গজকেষ্টবাবু ভীষণ ভেবড়ে গেলেন। এতকাল হাসতে হাসতে তিনিই সকলকে আক্রমণ করেছেন, পাল্‌টা এমন বেয়াড়া কুস্তির প্যাঁচের জন্যে আদৌ তৈরি ছিলেন না। তাঁর হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তাঁর হাসি বন্ধ হলে কী হয়—কানাই ছাড়বার পত্র নয়। সে গজকেষ্টবাবুর

কুইনিন মিক্‌শ্চারের ছিপি খুলে তার সবটা গজকেষ্টবাবুর মুখে ঢেলে দিলেন

ভুড়িতে আর পাঁজরায় বেদম সুড়্‌সুড়ি দিতে লাগল। গজকেষ্টবাবু প্রাণের দায়ে খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হাসতে লাগলেন—চোখ দুটো তাঁর কপালে চড়ে গেল।

আর তখন—

* গজকেষ্টবাবুর হাসি *

ঠিক সেই মুহূর্তেই—

কুইনিন মিকশ্চারের ছিপি খুলে তার সবটা গজকেষ্টবাবুর মুখে ঢেলে দিলেন প্রাণধন। গজকেষ্ট কেবল বলতে পারলেন : ওয়া ওয়াং।

তারপরই প্রাণধন আর কানাই দেখতে না দেখতে এক দৌড়ে হাওয়া! গজকেষ্ট রাস্তার মধ্যে পড়ে রইলেন গজ-কচ্ছপের মতো। আমি ছুটে গিয়ে গজকেষ্টবাবুকে তুলে বসালুম। গজকেষ্ট বিকট স্বরে বললেন, ওয়াফ-ওয়াফ্। বাপরে কী তেতো! প্যালা—সিরাপ এক বোতল—কুইক্। ওয়াফ্—ওয়াফ্।

গজকেষ্টবাবু আর হাসেন না। তাঁর সেই মারাত্মক হাসি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।

এমন ভয়ঙ্কর দাওয়াইয়ের পর আর কি হাসি আসে কারো? তোমরাই বলো।

সায়েবের উপহার

ভজকেষ্টবাবু দাওয়ায় বসে আমাকে বোঝাচ্ছিলেন যে, আজকালকার ইস্কুল-মাস্টারদের একেবারে মায়া-দয়া নেই। তাঁর ছোট ছেলে প্যাণ্ডা ক্লাসে পেটের অসুখে'র মানে লিখেছিল: 'আনহ্যাপিনেস্ অব্ দি বেলী'। তাতে মাস্টার তাকে কান ধরে বেঞ্চে দাঁড় করে দিয়েছে।

ভজকেষ্টবাবু মনে খুব ব্যথা পেয়ে আমাকে বলেছিলেন, তুমিই বলো তো প্যালারাম, পেট খারাপ হলে কি কারু মনে সুখ থাকে? বাড়িতে হয়তো তখন চিংড়ির কাটলেট্ ভাজা হচ্ছে,—গন্ধে ম-ম করছে চাদ্দিক, আর যার পেটের অসুখ, সে হয়তো বসে বসে বার্লির জল খাচ্ছে। তখন কি তার হ্যাপিনেস্ থাকে? আর ওই যে কী একটা শব্দ আছে—'ডায়ারহোইয়া' না কী যেন, ওটা লিখতে এই আমারই তিনটে কলম ভেঙে যায়। এইটুকু পুঁচকে প্যাণ্ডা কেমন করে এই কট্‌কটে বানান লিখবে বলো দিকি?

'ডাইরিয়া' বানান আমার কাছেও বিভীষিকা—লিখতে বললেই পেট গর্-গর্ করে ওঠে। আমি খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলতে যাচ্ছি, 'আজ্ঞে ঠিকই তো', এমন সময় একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল।

ভজকেষ্টবাবুর নতুন হিন্দুস্থানী চাকর যম্‌না ('যম না' বললে কী হয়, চেহারা প্রায় যমের মতো মস্ত আর কালো) একটা থলে করে বাজার নিয়ে এল। আর দেখা গেল থলের মুখে উঁকি দিচ্ছে একটা কুমড়োর ফালি। দেখেই ভজকেষ্টবাবু মোড়া থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর হুঁকোটা উল্‌টে গেল, আর তা থেকে বগ্‌বগ্ করে খানিক লালচে ময়লা জল বেরিয়ে আমার পুজোর নতুন স্যাণ্ডেলটাকে ভিজিয়ে দিলে।

ভজকেষ্টবাবু চীৎকার করে বললেন, এই যম্‌না—তুম কাহে কুমড়ো আনা হ্যায়?

যম না অথচ যমের মতো দেখতে যম্‌না ভীষণ ঘাবড়ে গেল। বললে, ই তো বড়িয়া চীজ্ হ্যায় বাবু!

* সায়েবের উপহার *

—বড়িয়া চীজ্! হাম্‌কা মুণ্ডু! আভি ফেলে দাও কুমড়ো। ওই কুমড়ো যদি বাড়ি মে ঢুকেগা—তব্ হামি আভি যাঁহা মে চোখ যায়—তাঁহা চলে যায় গা!

ওই কুমড়ো যদি বাড়ি মে ঢুকেগা—তব্ হামি আভি যাঁহা মে চোখ যায়—

যমুনা নিজে বোধ হয় ভীষণ কুমড়ো ভালোবাসে—তাই বুকভাঙা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে কুমড়োটা তুলে ছুঁড়ে দিলে রাস্তায়। দুটো ছাগল কাছাকাছিই চরছিল—

তারা একেবারে মার মার' করে কুমড়োর ওপর এসে পড়ল। দু' মিনিটের মধ্যে কুমড়ো ফর্সা! তারপরে চোখ গোল গোল করে যেভাবে তাকাতে লাগল, তাতে মনে হল যমের মতো যমুনাকে সামনে পেলে তাকেও ওরা সাবাড় করে দিত।

যমুনা বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল। ছাগল দুটো খুব ব্যাজার হয়ে রাস্তা থেকে জুতোর সোল, কিংবা শুকনো পাতা কিংবা পেরেক-টেরেক যাহোক কিছু কুড়িয়ে নিয়ে চিবুতে লাগল। আর আমি ভজকেষ্টবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, কুমড়ো দেখে আপনি অত চটলেন কেন? চিংড়ি মাছ-টাছ দিয়ে খেতে তো খুব খারাপ লাগে না।

—খারাপ লাগবে কেন? ভজকেষ্টবাবুর মুখ করুণ হয়ে উঠল: আমিও তো কুমড়ো খেতে খুবই ভালোবাসতুম। কেউ কুমড়োর ছোকা খাওয়াবে বললে আমি দু'মাইল হেঁটে যেতে রাজী ছিলুম তার সঙ্গে। কিন্তু এক মিলিটারী সায়েব- ভজকেষ্ট এবার ফোঁস্-ফোঁস্ করে তিনটে নিঃশ্বাস ফেললেন: সে মর্মভেদী কাহিনী শুনবে প্যালারাম? বোসো—বলি তা হলে—

তখন আসামে খুব যুদ্ধ হচ্ছে—জানলে? ওই মণিপুর-টনিপুরের দিকে। আমি সে সময় যাচ্ছি ডিব্রুগড়ে—আমার বড়মেয়ে ফুট্‌কি ওখানেই থাকে কিনা। তাকে দেখতে যাচ্ছি। সঙ্গে নিয়েছি দশসের নতুন গুড়ের পাটালী। ফুট্‌কি পাটালী খুব ভালোবাসে।

পাণ্ডু থেকে রেলে উঠেছি আর বরাত জোরে পেয়ে গেছি একটা ছোট্ট কামরা। বেশ শীত পড়েছে। বালাপোশ জড়িয়ে আরামে বসে আছি আর ভাবছি, ফুট্‌কি খাওয়ায়-দাওয়ায় খুব ভালো। আর এই যে নলেন গুড়ের পাটালী নিয়ে যাচ্ছি এ দিয়ে নিশ্চয় রোজ পায়েস তৈরি করবে। দিন সাতেক থাকব, এর মধ্যেই শরীর তেল-তাগড়া হয়ে যাবে।

এই সময় একটা ইস্টিশন থেকে এক মিলিটারী সায়েব এসে ঢুকল। হুঁকোর মতো মুখ, কাঁধে একটা পেল্লায় খাকি ঝোলা। এসে কিছুক্ষণ পিট্-পিট্ করে আমার দিকে তাকালে। আমার কেমন খটকা লাগল। মারধোর করবে কিনা কে জানে—মিলিটারীদের তো বিশ্বাস নেই। ভাবছি পরের স্টেশনেই গাড়ি বদলাব, এমন সময় সায়েবটা আমায় জিজ্ঞেস করলে, কাঁহা যায়েগা বাবু?

ভয়ে ভয়ে বললুম, ডিব্রুগড়।

—ডিব্রুগড়? ভেরি গুড্।

আমি ডিব্রুগড় যাব—তাতে ওর ভেরি গুড্ বলবার মানে কী? অনেকটা রাস্তা যাব—এই জন্যে? আর ও আমায় সারা রাস্তা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে, হাতের সুখ করতে করতে যাবে? ব্যাপারখানা কী?

গাড়ি তখনো ছাড়েনি। একটা ফিরিওলা কাচের বাক্সে করে পুরী রসগোল্লা এই সব নিয়ে যাচ্ছিল। সায়েব ফস্ করে আমায় জিজ্ঞেস করলে, ওই বক্সমে হোয়াট হ্যায়? ফুড্?

আমি বললুম, হাঁ সায়েব, ফুড্।

—উঃ, আই অ্যাম ভেরি হাংগ্রি—এই বলে সায়েবটা ফিরিওলাকে ডাকলে: এই ম্যান—ইধার আও।

ফিরিওলা বাক্স নামালে।

সায়েব খাবার দেখিয়ে আমায় ফের জিজ্ঞেস করলে, হুইচ্ ফুড গুড্ বাবু? মানে কোন্ খাবারটা ভালো?

আমি বাঙালি, বুঝতেই তো পারো রসগোল্লার নামে আমার বুক দু'হাত ফুলে যায়। বললুম, বাই রস্গুল্লা!

—রস্গুল্লা? সুইট্?

বললুম, সুইট্ মানে? হেভেন—একবার খেলে নেভার ফরগেট্।

—বটে, তাই নাকি?—সায়েব খুশি হয়ে চারটে বড় বড় রসগোল্লা কিনে ফেলল। তারপর ফিরিওলা যেতে না যেতেই দুটো রসগোল্লা গালে ফেলে দিলে।

চোখ বুজে বলতে যাচ্ছে গ্র্যাণ্ড্—তার আগেই 'মাই গড্—হোয়াট্' তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। হাঁউ-মাউ করে বললে, ইয়োর রস্গুল্লা বাইটিং!

রসগোল্লা কামড়াচ্ছে! তা কী করে হয়? রসগোল্লা কি কাউকে কামড়ায়? রসগোল্লাকেই তো সবাই কামড়ে থাকে।

সায়েব আবার বললে, ওঃ পাপা—বাইটিং এগেন! ফের কামড়াতা হ্যায়—বলে

থু থু করে মুখ থেকে ফেলে দিলে। দেখি—রসগোল্লার ভেতরে তিন-চারটে ডেঁয়ো পিঁপড়ে! কখন যে ফুটো করে বসে ছিল, ওরাই জানে!

ট্রেন তখন ইস্টিশন ছেড়ে অনেকখানি চলে এসেছে। কোথায় ফিরিওলা—কোথায় কী! ভাবলুম, এবারে আমি গেছি—মেরে আমাকে ঠিক আলু-চচ্চড়ি বানিয়ে দেবে। আমিই তো ওকে রসগোল্লা কেনার বুদ্ধি বাত্‌লে দিয়েছিলুম।

মনে মনে আওড়াচ্ছি: 'হরে কেষ্ট হরে কেষ্ট, কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে'—আর ভাবছি, সায়েবটা বুঝি এই খাঁক করে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু কিছুই করলে না। শুধু কিছুক্ষণ হুঁকোর মতো মুখখানাকে গড়গড়ার মতো করে বসে রইল। তারপর বললে, ইণ্ডিয়ান সুইট্ ব্যাড। ইট্ বাইট্‌স্! ওফ্!

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, ইণ্ডিয়ান সুইট্ কামড়ায় না—কামড়াচ্ছিল ডেঁয়ো অ্যান্টস্—কিন্তু বলতেই পারলুম না। সায়েবটা গাড়ির তালে তালে দুলে খালি খালি বলতে লাগল: ইণ্ডিয়ান সুইট্ বাইট্! ব্যাড্—ব্যাড্—ভেরি ব্যাড্!

শুনে শুনে আমার যেমন বিচ্ছিরি লাগল, তেমনি রাগ হয়ে গেল। আমরা বাঙালি—সব সইতে পারি, ভেতো—কাপুরুষ যা বলে বলুক, কিচ্ছুটি গায়ে লাগে না—কিন্তু মিঠাইয়ের নিন্দে করলে জাতির অপমান হয়ে যায়। ইচ্ছে করল, সায়েবটাকে নিয়ে একবারে দ্বারিক ঘোষ কিংবা ভীম নাগের দোকানে বসিয়ে দিই—বুঝুক সুইট্ কাকে বলে! কিন্তু আমাদের সেই চলতি গাড়িতে আমি আর কে. সি. দাসের রসোগোল্লাই বা পাচ্ছি কোথায়?

রাগ হলে কুবুদ্ধি হয়—আমারও তাই হল। বললুম, ইণ্ডিয়ান সুইটের তুমি কী জানো সায়েব। আমার কাছে যে চীজ আছে, তা যদি একটা খাও—তা হলে বাংলাদেশের খেজুরগাছতলায় তুমি রাতদিন গিয়ে বসে থাকবে।

সায়েবটা বললে, হোয়াট্?

আমি ঝাঁ করে মস্ত হাঁড়িটা খুলে একখানা পাটালী গুড় বের করে ফেললুম। বললুম, এইটে খেয়ে ছাখো তো একবার।

পাটালীর দিকে জুল-জুল করে তাকালে সায়েব।

'লা-লা-সা-লা' বলে আমার হাত ধরে চলতি গাড়ির মধ্যেই
নাচতে আরম্ভ করলে

—ইণ্ডিয়ান চকোলেট ?

—হাঁ, ইণ্ডিয়ান চকোলেট।

—নট্ বাইট্ ?

—ইট্ নট্ বাইট্। ইউ বাইট্ ইট্। মানে এ কামড়ায় না—তুমিই একে কামড়াতে পারো।

সায়েব পাটালীটা নিয়ে খানিকটা কী ভাবলে। দিলে এক কামড়—তারপর আর এক কামড়। তারপর তোমায় কী বলব প্যালারাম—হঠাৎ ছুটে এসে আমায় জাপটে ধরলে, আর 'লা-লা-লা-লা' বলে আমার হাত ধরে সেই চলতি গাড়ির মধ্যেই নাচতে আরম্ভ করলে।

যত বলি, 'ছাড়ো ছাড়ো—মারা গেলুম', সে কি ছাড়ে! পাক্কা দশটি মিনিট নিজে নাচলে—আমাকে নাচালে। আমার তখন কোমর টন টন করছে, মাথা বন বন করছে। যখন ছাড়লে তখন আমি প্রায় ভির্মি লেগে বসে পড়লুম বেঞ্চির ওপর।

এর মধ্যে সায়েব পাটালীখানা বেমালুম সাবড়েছে! বললে, ওঃ—কী জিনিস খাওয়ালে! জীবনে এমনটি আর কোনো দিন খাইনি। কোথায় লাগে এর কাছে চকোলেট—কেক—জ্যাম-জেলী! আর আছে ?

দিলুম আর একখানা।

দেখে বললে, ফুল ওয়ান হাঁড়ি ? মানে এক হাঁড়ি ভর্তি!

বললুম, হাঁ, ফুল ওয়ান হাঁড়ি। আমার মেয়ে ফুট্‌কির জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

—আই ডোণ্ট নো ফুট্‌কি-কমা-সেমিকোলন। এই হাঁড়িটা আমি নেব—তুমি আমাকে এটা প্রেজেণ্ট করো।

এই সেরেছে! পুরো দশসের নলেন পাটালী—পঁচিশটে টাকা দাম নিয়েছে! ইণ্ডিয়ান সুইটের বড়াই দেখাতে গিয়ে আচ্ছা ফ্যাচাঙেই পড়েছি তো! আমি কাতর হয়ে বললুম, দু-একখানা নিতে চাও তো নাও সায়েব, কিন্তু মাই ডটার, মানে আমার মেয়ে ফুট্‌কি—

—নো ফুট্‌কি—নো সেমিকোলন! এ হাঁড়ি আমায় দিতেই হবে।

* সায়েবের উপহার *

পড়েছি মিলিটারীর পাল্লায়। এমনিতে না দিলে তো জোর করে কেড়ে নেবে। সত্যি বলতে কি, আমার কান্না পেল।

আমার মুখ দেখে বোধ হয় সায়েবের দয়া হল। বললে, মন খারাপ কোরো না বাবু। এমনি নেব না। আমিও এর বদলে কিছু প্রেজেন্ট করব তোমাকে।

—কী প্রেজেন্ট করবে ?—আমি নড়ে উঠলুম। আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে ভ্যাবলা এক মিলিটারী সায়েবকে ভজিয়ে একটা ক্যামেরা বাগিয়েছে। আমারও আশা হল—নির্ঘাৎ দাঁও মারব একটা।

সায়েব বললে, আমার হাতের এই ঘড়িটা দেখেছ ? দুশো ডলার দাম। পছন্দ হয় ?

সোনার ঘড়ি—কী তার জেল্লা ! আমার বুকের ভেতর হাঁকু-পাঁকু করে উঠল। বললুম, আলবাৎ ! খুব পছন্দ হচ্ছে।

সায়েব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লে।

—উঁহু, এত তুচ্ছ জিনিস দিয়ে তোমার এমন আশ্চর্য ইণ্ডিয়ান সুইটসের দাম শোধ হয় না। আমার এই আংটিটা দেখছ ?

—দেখছি।

—হীরে বসানো আছে। হাজার ডলার দাম। পছন্দ হয় ?

পঁচিশ টাকার গুড়ের বদলে হাজার ডলার ! আমি অজ্ঞান হতে হতে সামলে গেলুম বলতে গেলে, তিনবার খাবি খেয়ে বললুম, খুবই পছন্দ সায়েব। তুমি ওটাই দাও।

সায়েব আংটিটা খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী ভেবে থেমে গেল আবার। বললে, উঁহু—না—না ! তোমার সুইটস্‌কে এত সামান্য দাম আমি দিতে পারি না—অপমান করা হয়। —তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে। একটা মস্ত বড় নিঃশ্বাস ফেললে শেষকালে।

বললে, না, এসব নয়। তোমাকে আমি এমন জিনিস দেব, যা পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয়, যা পেলে আমি সব ভুলে যাই—যা আমার চোখের আলো—মনের আশা—মুখের ভালো—বুকের মালা—তাই আমি তোমায় দিয়ে যাব। দিতে প্রাণ আমার চাইছে না, কিন্তু তোমার এই ইণ্ডিয়ান সুইটসের বদলে তা ছাড়া কী-ই বা আমি দিতে পারি !

বলে কিছুক্ষণ কেমন ভাবুক-ভাবুক হয়ে বসে রইল, যেন কেঁদে ফেলবে এমনি মনে হল আমার। গাড়ি তখন একটা বড় ইস্টিশানে এসে থামছে। সায়েব উঠে দাঁড়াল। কাঁধের মস্ত ভারী খাকি ঝোলাটা আমার হাতে দিয়ে বললে, নাও—এর মধ্যে সে জিনিস আছে। এর তুলনা নেই—এর মতো প্রিয় আমার আর কিছু নেই। অনেক আশা করে যোগাড় করেছিলুম—আবার কবে পাব কে জানে! যাই হোক তোমার ইণ্ডিয়ান চকোলেটের বদলে এই যৎসামান্য উপহার তোমায় দিলুম। আমায় মনে রেখো, বাই-বাই—

বলেই, আমার পাটালী গুড়ের হাঁড়িটা কাঁকালে তুলে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল। যুদ্ধের সময় স্টেশন ভর্তি মিলিটারী ঘুরছে—কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে।

ওই মস্ত বড় ঝোলাটা কোলে নিয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। বুকের ভেতর হাঁকুর-পাঁকুর চলছে! কী দিয়ে গেল কে জানে! সংসারে ওর সব চেয়ে প্রিয় জিনিস—চোখের আলো—বুকের কালো—কত কী বললে! হয়তো লাখ টাকার হীরে-মোতিই হবে।

ট্রেন ছাড়লে, কাঁপতে কাঁপতে আমি থলেতে হাত দিলুম। বেশ বড় গোল মতন কী একটা রয়েছে! সেই যে অতিকায় মুক্তোর বিবরণ পড়ি—তাই নাকি?

দেখলুম, বেশ যত্ন করে খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো। আমি টেনে বের করলুম। প্রাণ-পাখী তখন আশা-আনন্দে প্রায় খাবি খাচ্ছে! পঁচিশ টাকার পাটালী গুড়ের বদলে বোধ হয় পেলুম লাখ টাকার জিনিস!

খুলে দেখলুম—কী দেখলুম জানো প্যালারাম? মাঝারি সাইজের একটা কুমড়ো! একটা নিটোল নির্ভেজাল কুমড়ো!

এই তা হলে ওর চোখের আলো—মুখের ভালো! ছ আনা দামের একটা কুমড়ো গছিয়ে আমার পঁচিশ টাকার পাটালী গুড় মেরে দিলে! তোমায় বলব কি প্যালারাম—আমি তখুনি সেই শকে—একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

ভজকেষ্টবাবু থামলেন। করুণ গলায় বললেন, জানো প্যালারাম—সেই থেকে আমি কুমড়ো ছুঁই না, কুমড়ো দেখি না। আর দেখলেই পঁচিশ টাকার পাটালীর শোক আমার উথলে ওঠে।

দি গ্রেট ছাঁটাই

—ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

এই পর্যন্ত যেই বলেছি, অমনি খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে টেনিদা।

—টেক কেয়ার প্যালা, সাবধান করে দিচ্ছি। মেফিস্টোফিলিস পর্যন্ত সহ্য করেছি, কিন্তু 'ইয়াক্ ইয়াক্' বলবি তো এক চাঁটিতে তোর কান দুটোকে কোন্নগরে পাঠিয়ে দেব।

সেই ঢাউস ঘুড়িতে ওড়বার পর থেকেই বিচ্ছিরি রকমের চটে রয়েছে টেনিদা। ইয়াক্ শব্দ শুনলেই ওর মনে হয়, এক্ষুণি বুঝি ঝপাৎ করে গঙ্গার জলে গিয়ে পড়বে। সেদিন গণেশ মামা কায়দা করে ইংরেজীতে বলছিল : ইয়া-ইয়া! শুনে টেনিদা তাকে মারে আর কি!

শেষে হাবুল সেন গিয়ে ঠাণ্ডা করে: আহা, খামাকা চেইত্যা যাও ক্যান্? পেন্টুলুন পইর্যা ইংরাজী কইত্যাছে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিল, কেন, স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ফলাবার দরকারটা কী? এই জন্যেই জাতির আজ বড় দুর্দিন!···শেষ কথাটা টেনিদা আমাদের পাড়ার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে মেরে দিয়েছে। ওখানে অনেক মিটিং হয়, আর সবাই বলে, জাতির আজ বড় দুর্দিন। কাউকে বলতে শুনিনি, জাতির আজ ভারী সুদিন। অথচ যাওয়ার সময় দেখি, দিব্যি পান চিবুতে চিবুতে মোটরে গিয়ে উঠল। মরুক গে, জাতির দিন যেমনই হোক আমার আজকের দিনটা দারুণ রকমের ভালো। মানে, আজ সন্ধ্যেয় আমাদের বল্টুদার পিসতুতো ভাই হুলোদার বউভাত। বল্টুদা আমাকে খেতে বলেছে। আমি বললুম, বা-রে মন খুশি হলে একটুখানি ফুর্তিও করতে পারব না?

—ফুর্তি? বলি হঠাৎ এত ফুর্তিটা কিসের? আমি সকাল থেকে একটুখানি আলু-কাবলি খেতে পাইনি—চার পয়সার ডালমুটও না। মনের দুঃখে মরমে মরে আছি, আর তুই কুচো চিংড়ির মতো লাফাচ্ছিস্?

বললুম, লাফাব না তো কী? আজ হুলোদার বউভাত।

—হুলোদার বউভাত ?—টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটার ভেতর থেকে ঘুরুৎ করে একটা আওয়াজ বের করে বললে, তাতে তোর কী ?

—দারুণ খ্যাঁট্ হবে সন্ধ্যেবেলায়।

—হুলোদার বউভাতে খ্যাঁট্ ?

টেনিদার নাক থেকে আবার ফুড়ুৎ করে আওয়াজ বেরুল : মানে নেংটি ইন্দুরের কালিয়া, টিকটিকির ডালনা, আরশোলার চাট্‌নি—

—কক্ষণো না।—আমি ভীষণভাবে আপত্তি করে বললুম, লুচি-পোলাও-মাংস-চপ-ফ্রাই-দই-ক্ষীর-দরবেশ—

টেনিদা প্রায় হাহাকার করে উঠল : আর বলিস্‌নি, আমি এক্ষুণি হার্টফেল করব। সকাল থেকে একটুখানি আলু-কাবলি অবধি খাইনি, আর তুই আমাকে এমন করে দাগা দিচ্ছিস্ ? গো-হত্যের পাপে পড়ে যাবি প্যালা, এই বলে দিচ্ছি তোকে।

শুনে আমার দুঃখু হল। আমি চুপ করে রইলুম।

—হ্যাঁ রে, আমাকে তো বলেনি।

আমি বললুম, না বলেনি।

—আমি যদি তোর সঙ্গে যাই ? মানে, তোর তো পেট-টেট্ ভালো নয়—বেশি খেয়ে-টেয়ে একটা কেলেঙ্কারী যাতে না করিস্, সেইজন্যে যদি তোকে পাহারা দিতে—

আমি বললুম, চালাকী চলবে না। হুলোদার বাবা ভীষণ রাগী লোক। কান পর্যন্ত গোঁফ। দু'বেলা দু'টো একমণী মুগুর ভাঁজেন। বিনা নেমন্তন্নে খেতে গেলে তোমাকে ছাদ থেকে ফুটপাথে ফেলে দেবেন।

টেনিদা ভারী ব্যাজার হয়ে গেল। বললে, আমি দেখছি, যে সব বাবার বড় বড় গোঁফ থাকে তারাই এম্‌নি যাচ্ছে-তাই হয়। বোধ হয় নিজেদের বাঘ সিঙ্গী বলে ভাবে। আর যে সব বাবা গোঁফ কামায় তাদের মেজাজ খুব মোলায়েম। দেখলেই মনে হয় এক্ষুণি মিহি গলায় বলবে, খোকা, দুটো রসগোল্লা খাবে ? আর গোঁফওয়ালা বাবাদের ছেলেরা দু'বেলা গাঁট্টা খায়।

এই সকালবেলায় গোঁফ নিয়ে বকবকানি আমার ভালো লাগল না। চলে যাওয়ার

জঙ্গে পা বাড়িয়েছি, অমনি টেনিদা বললে, খ্যাট্ তো সন্ধ্যেবেলায়—এখুনি গিয়ে কলাপাতা কাটবি নাকি ?

—কলাপাতা কাটব কেন ? আমি কি ওদের চাকর রামধনিয়া ? আমি যাচ্ছি চুল কাটতে।

বলে ডাঁটের মাথায় চলে যাচ্ছি, টেনিদা আবার পিছু ডাকল—কোথায় চুল কাটবি ? সেলুনে ?—চল্, আমি তোর সঙ্গে যাই।

আমার মনে নিদারুণ একটা সন্দেহ হল।

—আবার তুমি কেন ? আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি—তোমার যাবার কী দরকার ?

টেনিদা বললে, দরকার আছে বই কি। বউভাতের নেমন্তন্ন খাবি—যা-তা করে চুল ছেঁটে গেলে মান থাকবে নাকি ? এমন একখানা মোক্ষম ছাঁট লাগাবি যে, লোকে দেখলেই হাঁ করে থাকবে। চল্, আমি তোর চুল কাটার তদারক করব।

কথাটা আমার মনে লাগল। সত্যিই তো টেনিদা একটা চৌকস লোক—দশ রকম বোঝে। আর চুপি চুপি বলতে দোষ নেই, একা সেলুনে ঢুকতে আমারও কেমন গা ছম-ছম করে। যে রকম কচাকচ কাঁচি-টাচি চালায় মনে হয় কখন কচাং করে একটা কানই বা কেটে নেবে !

বললুম, চলো তা হলে।

প্রথমেই চোখে পড়ল, ওঁ তারকব্রহ্ম সেলুন।

যেই ঢুকতে যাচ্ছি, অম্‌নি হাঁ-হাঁ করে বাধা দিল টেনিদা—খবর্দার প্যালা, খবর্দার। ওখানে ঢুকেছিস্ কি মরেছিস্ !

—কেন ?

—নাম দেখছিস্ না ? ওঁ তারকব্রহ্ম। ওখানে ঢুকলে কী হবে জানিস্ ? সব চুলগুলো কদমছাঁট করে দেবে আর চাঁদির ওপর টিকি বানিয়ে দেবে একখানা ; হয়তো টিকির সঙ্গে ফ্রীতে একটা গাঁদা ফুলও বেঁধে দিতে পারে—কিচ্ছুই বলা যায় না।

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, না, আমি টিকি চাই না, ফ্রী গাঁদা ফুলেও দরকার নেই।

—তবে চট্‌পট্ চলে আয় এখান থেকে। দেখছিস্ না একটা হোঁৎকা লোক কেমন

—টেনিদা, এইখানেই ঢোকা যাক!

জুল-জুল করে তাকাচ্ছে? আর দেরী করলে হয়তো হাত ধরে হিড়হিড় করে ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে।

তক্ষুণি পা চালিয়ে দিলুম। একটু এগোতেই বিউটি-ডি-সেলুনিকা।

* দি গ্রেট্ ছাঁটাই *

একে বিউটি, তায় আবার সেলুনিকা দেখেই আমার কেমন ভাব এসে গেল। বলতে ইচ্ছে করল: সত্যিই সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ। তারপর কী যেন—রাতে প্রচণ্ড সূর্য-টুর্য—ওসব আর মনে পড়ল না।

—টেনিদা এইখানেই ঢোকা যাক!

শুনেই টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ, এইখানেই ঢুকবি বই কি! পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খাস্, তোর বুদ্ধি আর কত হবে!

—কেন? নামটা তো—

—হ্যাঁ, নামটাই তো। ঢুকেই দ্যাখনা একবার। ঠিক কবিদের মতো বাবরী বানিয়ে দেবে। পেছন থেকে দেখলে মনে হবে মেম সায়েব হেঁটে যাচ্ছে। আর কেউ যদি তোকে ঠ্যাঙাতে চায়, তা হলে ওই বাবরী চেপে ধরে—

শুনেই আমার বুক দমে গেল। এমনিতেই ছোট কাকা আমার কান পাকড়াবার জন্যে তক্কে তক্কে থাকে, বাবরী পেলে কী আর রক্ষে থাকবে! কান প্লাস্ বাবরী একেবারে দু'দিক থেকে আক্রমণ!

—না—না, তবে থাক।

আমি বাঁই বাঁই করে প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে গেলুম। আর টেনিদা লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে তিন লাফেই ধরে ফেলল আমাকে: বুঝলি প্যালা, সেলুন ভারী ডেঞ্জারাস জায়গা। বলতে গেলে সুন্দরবনের চাইতেও ভয়াবহ। বুঝে সুঝে ঢুকতে না পারলেই স্রেফ্ বেঘোরে মারা যাবি। সেইজন্যেই তো তোর সঙ্গে এলুম। আর দেখলি তো আমি না থাকলে এতক্ষণে হয়তো তোর ঘাড় ঝাঁপানো বাবরী কিংবা দেড় হাত টিকি বেরিয়ে যেত।

—কিন্তু চুল তো ছাঁটতেই হবে টেনিদা!

—আলবৎ ছাঁটতে হবে।—টেনিদার গলার আওয়াজ গম্ভীর হয়ে উঠল: চুল না ছাঁটলে কি চলে? ছাঁটবার জন্যেই তো চুলের জন্ম। যদি চুল ছাঁটবার ব্যবস্থা না থাকত, তা হলে কি আর চুল গজাত? দ্যাখ্না ক্ষুর আছে বলেই মানুষের মুখে গোঁফ উঠেছে। তবু সংসারে এমন এক একটা পাষণ্ড লোক আছে যারা গোঁফ কামায় না আর ক্ষুরকে অপমান করে।

নিশ্চয় হুলোদার বাবার কথা বলছে। আমার কিন্তু ও-সব ভালো লাগছিল না। বলতে যাচ্ছি 'গোঁফ-টোফ এখন থামাও না বাপু'—এমন সময় দেখি আর একটা সেলুন।

সুকেশ কর্তনালয়! আবার ইংরেজী করে লেখা : দি বেস্ট্ হেয়ার-কাটিং।

—টেনিদা, ওই তো সেলুন।

—সেলুন?—টেনিদা ভুরু কোঁচকালে, তারপর নাক বাঁকিয়ে পড়তে লাগল : সুকেশ কর্তনালয়। কর্তনালয়। বাপ্স!

—বাপ্স!—বাপ্স কেন?

টেনিদা এবার বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কট্মট করে কিছুক্ষণ তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎ আমার চাঁদির ওপর পটাং করে গোটা দুই টোকা মেরে বললে, গাঁট্টা খেতে পারবি?

আমি বিষম চমকে উঠে বললুম, মিছিমিছি আমি গাঁট্টা খাব? আমার কী দরকার?

—গুরুজনের মুখে মুখে তক্কো করিস্ ক্যান্ র‍্যা? যা বলছি জবাব দে। খেতে পারবি গাঁট্টা? পাঁচ-দশ-পনেরোটা?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, একটাও না, একটা খেতেও রাজী নই।

—সাতটা চাঁটি?

বললুম, কি বিপদ! হচ্ছে সেলুনের কথা—চাঁটি আসে কোত্থেকে?

—আসে-আসে। চাঁটাবার মওকা পেলেই আসে।

—নে—জবাব দে এখন। খাবি চাঁটি?

—কক্ষণো না।

—না?—টেনিদার গলা আরো গম্ভীর : 'জাড্যাপহ' শব্দের মানে জানিস্?

—না।

—উড়ুম্বর?

—না, তাও জানি না। আমি বিব্রত হয়ে বললুম, যাচ্ছি চুল কাটতে—তুমি কেন যে এসব ক্যাচাং—

কথাটা শেষ করার আগেই টেনিদা গর্জন করে উঠল : স্তব্ধ হও-রে-রে বাচাল!—

তারপর আবার গম্ভ করে বললে, জানিস্ কুট্‌মল মানে কী? বল্ দেখি, মৎকুণিকা অর্থ কী?

আমি কাতর হয়ে বললুম, কী যে বলছ টেনিদা, কোনো মানে হয় না। তুমি কি পাগল, না পারশে মাছ যে খামোকা এই সব বক্‌বক্ করে—

টেনিদা আবার আমার চাঁদিতে পটাং করে একটা টোকা মারল—ওরে গাধা! সেলুনের নাম দেখেও বুঝতে পারিস্ নি? কর্তনালয়, তার ওপর আবার সুকেশ! ও রকম নাম কে দিতে পারে? কোনো হেড্ পণ্ডিত। নিশ্চয় ইস্কুল থেকে পেনসন নিয়ে এখন সেলুন খুলেছে। যেই ঢুকবি অমনি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার শিরোরুহ কি সমূলে উৎপাটিত হইবে?' তুই বুঝতে পারবি না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি। তখন রেগে তোকে চাঁটি গাঁট্টা লাগিয়ে বলবে, 'অরে-রে অনড্বান্, সত্বর বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক প্রথম ভাগ পাঠ কর'—না—না 'পাঠ করহ'।

শুনে, আমার পালাজ্বরের পিলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তবুও সাহসের ভান করে বললুম, যত সব বাজে কথা, গিয়েই দেখি না একবার।

টেনিদা বললে, যা না, যেতেই তো বলছি তোকে। যা, ঢুকে পড়, এক্ষুণি যা—

এমনভাবে উৎসাহ দিলে আর যাওয়া যায় না, আমি তৎক্ষণাৎ এদিকের ফুটপাথে চলে এলুম।

—কিন্তু সেলুনে কি ঢোকা যাবে না টেনিদা?

টেনিদা চিন্তা করে করে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল: আমার মনে হচ্ছে ঢোকা উচিত নয়। একটু ভালো বাংলা-টাংলা যদি জানতিস্ তা হলেও বা কথা ছিল।

—তবে চুল কাটা হবে না?—আমার পালাজ্বরের পিলে হাহাকার করে উঠল: কিন্তু ভালো করে চুল ছাঁটতে না পারলে হুলোদার বউভাতে যাব কী করে?

টেনিদা বললে, দাঁড়া ভেবে দেখি। তার আগে চারটে পয়সা দে।

—আবার পয়সা কেন?

—ডালমুট খাব, খেলে মগজ সাফ হবে, তখন বুদ্ধি বাতলে দেব।

কী আর করি, দিতেই হল চার পয়সা।

টেনিদা ঐ চার পয়সায় ডালমুট কিনে বেশ নিশ্চিন্তে বুদ্ধি সাফ করতে লাগল, আমাকে একটুও দিলে না।

—টেনিদা, একবার ছোট কাকার অফিসে গেলে কেমন হয়?

টেনিদার ডালমুট চিবোনো বন্ধ হল: সে কি-রে! তোর ছোট কাকার সেলুন আছে নাকি?

—না-না, সেলুন নয়। ছোট কাকা বলছিল ওদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। গেলে আমার চুলটাও নিশ্চয় ছাঁটাই করে দেবে।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, দূর বোকা—অফিসে কি চুল ছাঁটে? সে অন্য ছাঁটাই।

—কী ছাঁটাই?

—বোধ হয় জামা-কাপড় ছাঁটাই। কান-টানও হতে পারে। কি জানি, ঠিক বলতে পারব না। তবে চুল ছাঁটে না। তা হলে আমার কুট্টিমামার ধামার মতো চুলগুলো কবে ছেঁটে দিত।

তাই তো!—মনটা দমে গেল।

—তবে কী করা যায়?

টেনিদা ডালমুটের তলার নুনটা চাটতে চাটতে বললে, ওই তো—গাছটার তলায় ইট পেতে পরামানিক বসে আছে, চল্ ওর কাছে—

—কিন্তু পরামানিক?—আমি গজ্‌গজ করে বললুম, ওরা ভাল চুল কাটে না।

—তোকে বলেছে!—টেনিদা রেগে বললে, ওই বিড়ালই বনে গেলে বাঘ হয়—বুঝলি? এখন নিতান্ত ফুটপাথে বসে আছে, তাই ওর কদর নেই। একটা সেলুন খুললেই ওর নাম হবে 'দি গ্রেট্ কাটার'। চল্ চল্—আমার পিঠে একটা থাবড়া দিয়ে টেনিদা বললে, আমি আছি না সঙ্গে? এমন ডিরেক্‌শন্ দিয়ে দেব লোকে বলবে, প্যালা ঠিক সায়েব-বাড়ি থেকে চুল ছেঁটে এসেছে। কোনো ভাবনা নেই—আয়—

কী আর করি, পরামানিকের সামনে বসেছি ইট পেতে। টেনিদা থাবা গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে সাম্‌নে। দেখছে মনের মতো ছাঁট হয় কিনা।

—হিঁয়া-সে চার ইঞ্চি কাট্ দেও, ফের হিঁয়া দু ইঞ্চি ঘাড় ছাঁচকে দেও

কুর-কুর করে কাঁচি চলেছে, আমিও বসে আছি নিবিষ্টমনে। হঠাৎ টেনিদা হাঁ হাঁ করে উঠল : এ পরামানিক জী, ঠারো ঠারো।

পরামানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, ক্যা ভৈল্ বা ?

—ভৈল্ না। মানে ঠিক হচ্ছে না। অ্যায়সা নেহি। ওভাবে ছাঁটলে চলবে না

পরামানিক বললে, তো কেইসা ?

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, কেন বাগড়া দিচ্ছ টেনিদা ? বেশ তো কাটছে—কাটুক না।

টেনিদা দাঁত বের করে বললে, কাটুক না! যা-তা করে কাটলেই হল ? এ হল বউভাতের ছাঁট, এর কায়দাই আলাদা। যা খুশি কেটে দেবে, আর শেষে লোকে আমারই বদনাম করে বলবে, ছি—ছি—পটলডাঙার টেনিরাম কাছে থাকতেও প্যালা যাচ্ছেতাই চুল ছেঁটে এসেছে! রামোঃ!

পরামানিক অধৈর্য হয়ে বললে, কেইসা ছাঁটাই ? বোলিয়ে না।

—বোল্তা তো হ্যায়!—টেনিদা আমার মাথায় আঙুল দেখিয়ে বলে চলল : হিঁয়া দু ইঞ্চি ছাঁট্কে দেও, হিঁয়া তিন ইঞ্চি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমার কায়দায় দরকার নেই টেনিদা—ও যেমন কাটছে কাটুক।

—শাট্ আপ! ছেলেমানুষ তুই—গুরুজনের মুখে মুখে কথা বলিস্ কেন ?—শুনো জী পরামানিক, হিঁয়া-সে চার ইঞ্চি কাট্ দেও—হিঁয়া ফের এক ইঞ্চি—হিঁয়া দু ইঞ্চি ঘাড় ছাঁচকে দেও—

পরামানিক এবার রেগে গেল : ওইসা নেহি হোতা।

টেনিদা বললে, জরুর হোতা। তুম্ কাটো।

পরামানিক বললে, নেহি—ওইসা কভি নেহি হোতা।

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, দোহাই টেনিদা, পায়ে পড়ছি তোমার, ওকে কাটতে দাও—

টেনিদা গর্জন করে বললে, চোপ রাও। তুম্ কাটো পরামানিক জী—

পরামানিকের আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে তখন। নিজের সংকল্পে সে অটল।

—নেহি, হোতা নেহি।

—আলবৎ হোতা। কয়ঠো ছাঁট দেখা তুম্? তুম্ ছাঁটের কেয়া জানতা? কাটেগা

—নেহি কাটেগা। বদনাম হো যায়েগা হাম্‌কো। ওইসা নেহি হোতা।

—নেহি হোতা?—টেনিদা এবার চেঁচিয়ে উঠল: সব হোতা। আকাশে স্পুটনিক হোতা—মাথামে টাক হোতা—মুরগী আজ ঠ্যাং নিয়ে চলে বেড়াতা, কাল সেই ঠ্যাং প্লেটমে কাট্‌লেট্ হো-যাতা। সব হোতা, তুম্ নেহি জান্‌তা!

—হাম্ নেহি জান্‌তা?

—নেহি জান্‌তা।—টেনিদার গলার স্বর বজ্র-কঠোর।

—আপ জান্‌তে হেঁ?—পরামানিক এবার চ্যালেঞ্জ করে বসল।

—জরুর জান্‌তে হেঁ!—টেনিদা দারুণ উত্তেজিত।

—তো কাটিয়ে!

পরামানিকের বলবার অপেক্ষা মাত্র। পটাং করে টেনিদা তার কাঁচি হাত থেকে কেড়ে নিলে। আর আমি—'বাবা-রে—মারে—পিসিমারে'—বলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠবার আগেই আমার চুলে টেনিদার কাঁচি চলতে লাগল: এই দেখো চার ইঞ্চি—এই দেখো পাঁচ ইঞ্চি—এই দেখো—ইয়ে তিন ইঞ্চি—দেখো—

কিন্তু পরামানিক দেখবার আগেই আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখছি তখন। উঠে প্রাণ-পণে ছুট মেরেছি আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছি: মেরে ফেললে—ডাকাত—খুন—

আমার পেছনে রাস্তার লোক ছুটছে; কুকুর ছুটছে, পরামানিক ছুটছে, পুলিস ছুটছে। আর সকলের আগে ছুটছে কাঁচি হাতে টেনিদা। বলছে, দাঁড়া প্যালা—দাঁড়া। একবার ওকে ভালো করে দেখিয়ে দিই ছাঁট কাকে বলে—

হুলোদার বউভাতে সবাই পোলাও মাংস ফ্রাই সন্দেশ খাচ্ছে এতক্ষণে, আর আমি? একেবারে মোক্ষম ছাঁট দিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছি। অর্থাৎ ন্যাড়া হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই ছাঁট নিয়ে কোনোমতেই বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া চলে না। আর চাটুয্যেদের রোয়াক থেকে কে যেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে বললে, ডি-লা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্—ইয়াক্—ইয়াক্! মনে হল, টেনিদারই গলা।

———

অন্যমনস্ক চোর

তোমরা কখনো অন্যমনস্ক চোর দেখেছ? আমি একবার দেখেছিলুম। সেই কথাই বলি।

আমাদের কলকাতার বাসায় তখন কেউ নেই। গরমের ছুটি হওয়াতে সবাই দার্জিলিং বেড়াতে চলে গেছে। একশো আট ডিগ্রির জ্বালায় আমি একা বসে ছটফট করছি। অথচ আমার কলকাতা ছাড়বার যো নেই—আই. এ. পরীক্ষার একগাদা খাতা দেখতে হচ্ছে।

সেদিন রাতে কিছুতেই ঘুম আসছে না। একে তো প্রায় সাড়ে বারোটা অবধি খাতা দেখেছি—মাথার মধ্যে বানান আর ব্যাকরণের ভুলগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে। তায় অসহ্য গরম—ঘুরন্ত পাখাটাও যেন আগুন বৃষ্টি করছে।

অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে সবে একটু ঝিমুনি এসেছে, হঠাৎ শুনতে পেলুম, ধ্যাৎ, সিন্দুকটা গেল কোথায়?

ভাবলুম স্বপ্ন দেখছি, তক্ষুণি আবার কানে এল: ড্রেসিং টেবিলটাও উড়ে গেল নাকি?

আর সন্দেহ নেই—ঘরে কেউ ঢুকেছে। পুরো চোখ মেলে পরিষ্কার দেখলুম, জানালার কাছে কে দাঁড়িয়ে।

মাথার পাশেই টিপয়ের ওপরে টেব্‌ল ল্যাম্প ছিল। সুইচ্‌ টিপে সেটা জ্বাললুম। যা ভেবেছি তাই, ঘরে চোর ঢুকেছে। সাদা বেনিয়ান আর ধুতিপরা একটা বেঁটে মতো লোক—জানালার পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে। 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে যাব, তার আগেই লোকটা হাতযোড় করে বললে, কিছু মনে করবেন না স্যার—আপনার ঘুমের ডিস্টার্ব করলুম। একটু ভুল হয়ে গেছে।

লোকটার কথার ভঙ্গীতে ভয় কেটে গিয়ে ভারী আশ্চর্য লাগল আমার। বললুম, তার মানে?

সে বললে, এটা তো বায়ান্ন নম্বরের বাড়ি নয়?

আমি বললুম, না—বাইশ নম্বর।

* অন্যমনস্ক চোর *

লোকটা বললে, দেখলেন তো, ঠিক ধরেছি। বায়ান্ন নম্বরের জানালা বেয়ে উঠলেই ডানদিকের দেওয়ালে লোহার সিন্দুক—এই তার নকল চাবি।—বলে সে আমাকে একটা ছোট চাবি দেখালে। তারপরে বলে চলল, আর লোহার সিন্দুকের পাশেই হল ড্রেসিং টেবিল—আজ রাতে গিন্নিমা সিনেমা থেকে ফিরে তার টানায় গয়নাগুলো খুলে রাখবেন। ঘরে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি সব গড়বড় হয়ে গেছে। ভালো কথা, এটা প্যারীচাঁদ লেন তো?

আমি বললুম, না—পটলডাঙা লেন।

—ওই দেখুন—রাস্তাতেও গণ্ডগোল। ধ্যাৎ—ভালো লাগে নাকি? কী বিচ্ছিরি ভুল দেখুন তো?

লোকটার কথাবার্তা অদ্ভুত লাগছিল। মাঝরাতে জানালা বেয়ে ঘরে ঢুকে এ আবার কী রসিকতা শুরু করলে। বললুম, ব্যাপার কি হে, তোমার মাথা খারাপ নাকি?

—মাথা খারাপ হতে যাবে কেন স্যার? আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? আমি চোর।

—চোর!

—অত অবাক হয়ে গেলেন কেন?—লোকটা প্রায় আমাকে ধমকই লাগিয়ে দিলে একটা: রাত্তির বেলা আপনার ঘরের জানলা দিয়ে চোর ঢুকবে না তো ডাকপিয়ন ঢুকবে নাকি? কী যে বলেন—কিছু মানে হয় না।

আমি বললুম, অ, বুঝেছি। বায়ান্ন নম্বর প্যারীচাঁদে চুরি করতে গিয়ে বাইশ নম্বর পটলডাঙায় ঢুকেছ!

—ইয়া, ঠিক ধরেছেন এবারে। কিন্তু কী ল্যাঠা বলুন দিকি? এতটা জানালা বেয়ে উঠেছি, জলের পাইপের ঘষায় হাঁটুর ছাল উঠে গেছে—বুকের ভেতর হাঁফ ধরছে; এখন কি আর প্যারীচাঁদ লেনে যেতে ইচ্ছে করে? আপনার ঘরে একটু বসব স্যার? জিরিয়ে নেব একটুখানি?

আমার বেশ লাগছিল চোরটাকে। বললুম, তা বসতে পারো।

বলেই আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলুম।

—আপনার ঘরে একটু বসব স্যার? জিরিয়ে নেব একটুখানি?

—আরে, আরে—ওটা কিসের ওপর বসছ?

কিন্তু ততক্ষণে যা করবার তা করে ফেলেছে। টুলের পাশে কুঁজোটা ছিল, ভুল করে

টুল ভেবে চেপে বসতে গেছে কুঁজোয়—আর তক্ষুণি পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে। কুঁজো ভেঙে চৌচির। ঘরময় জল!

বোকার মতো একগাল হেসে উঠে দাঁড়াল ভিজে জবজবে।

আমি রেগে বললুম, এটা কী হল শুনি?

লোকটা গাল চুলকে বললে, আপনার একটু ড্যামেজ করে ফেললুম স্যার! কিছু মনে করবেন না। নিজেও একদম ভিজে গেছি।

বললুম, টুলটা টেনে ভালো করে দেখে বোসো। আবার রেডিওটার ওপরে চাপতে যেয়ো না।

সে বললে, না স্যার, বার বার কি আর ভুল হয়? একটা ঝাঁটা দিন—ঘরটা সাফ করে ফেলি! এই যে পেয়েছি—বলে সে আমার ছাতাটা তুলে নিলে।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললুম, রাখো—রাখো—ওটা ঝাঁটা নয়, ছাতা। খুব হয়েছে, তোমার আর ঘর সাফ করবার দরকার নেই।

লোকটা লজ্জিত হয়ে টুলটার ওপর বসে পড়ল। বার কয়েক কান-টান চুলকে বললে, একটা বিড়ি খাব স্যার? কিচ্ছু মনে করবেন না?

—মনে করব কেন—খাও না।

বলতেই বুক-পকেট থেকে টিনের কৌটো আর দেশলাই বের করলে। তারপর একটা দেশলাইয়ের কাঠি মুখে দিয়ে বিড়িটাকে দেশলাইয়ের গায়ে ঘষতে লাগল।

—ধ্যাৎ—ধরছে না! কী যাচ্ছেতাই দেশলাইয়ের কাঠি।

আমি বললুম, কী পাগলামো হচ্ছে—শুনি? ভালো করে তাকিয়ে দেখো তো কী ঘষছ!

—এঃ হে, তাই ধরছে না! বলেই সে বিড়িটা ফেলে দিলে। তারপর ফস্ করে দেশলাই ধরিয়ে নিজের মুখের কাঠিতে ঠেকাল। সেটা ফড়াং করে জ্বলে উঠতেই চমকে এক লাফ!

—ইস্—নাকটা পুড়ে গেল স্যার! উঃ—উঃ…

বললুম, বিড়ির বদলে দেশলাইয়ের কাঠি ধরালে নাক পোড়েই।

—তাই তো দেখছি।—লোকটা ব্যাজার হয়ে উঠল: দুত্তোর, বিড়ি আর খাবই না।—বলে সে রেডিওটার ওপর চেপে বসতে গেল।

—আরে, আরে—ওটায় নয়—টুলে বোসো।—আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

—ঠিক ধরিয়ে দিয়েছেন স্যার!—লোকটা আপ্যায়িত হল: আর একটু হলেই রেডিওটা শুদ্ধু আমি আছাড় খেতুম। কিন্তু নাকটা খুব জ্বলছে—বুঝলেন। বোধ হয় ফোস্‌কা পড়বে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ফোস্‌কা পড়াই উচিত—তোমার যেমন কাণ্ড! এত ভুলো মন নিয়ে চুরি করো কী করে?

নাকের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে, ওই জন্যেই তো মধ্যে মধ্যে ভারী মুশকিল হয় স্যার! মাস ছয়েক আগে কী কাণ্ড করেছিলুম—জানেন? ভিড়ের মধ্যে ট্রামে উঠেছি—পকেট মারব। একজনের পয়সা-বাঁধা রুমালটা তুলে নিয়ে যেই ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়েছি—সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বললে, 'পকেটমার পকেটমার!' লোকে তাড়া করলে—আমিও টেনে দৌড়। রাস্তার ডান দিকের গলি ভুল করে বাঁ দিকে ছুটলুম—সোজা কোথায় ঢুকলুম গিয়ে—জানেন? থানার মধ্যে!

—থানার মধ্যে?

—তাতে দুঃখু ছিল না স্যার! আসলে গোলমালটা হল অন্য জায়গায়। যে রুমালটা অন্যের পকেট থেকে নিয়েছি ভেবেছিলুম—সেটা আমারই রুমাল। ভিড়ের ভেতর অন্যের ভেবে নিজেরই পকেট মেরেছি। তাতে ছোট ছোট আলু ভাজার মতো পাঁচটা নয়া পয়সা বাঁধা ছিল।

—বলো কি!

লোকটা উত্তেজিত হয়ে বললে, একটা পাহারাওয়ালার কী আস্পর্ধা স্যার—আমাকে বললে; পাগল—করাচী চলে যা।

বললুম, করাচী নয়—রাঁচী।

লোকটা বললে, একই কথা স্যার। তা আমার খুব রাগ হল। পাহারাওয়ালাকে বোঁ করে একটা ঘুষি মেরে বললুম, জানিস্—আমি চোর, তবু তুই আমাকে পাগল বলিস্!

তোর ইচ্ছে হয়, তুই করাচী যা। আমি চোর, আমি হাজতে ঢুকব।—এই বলে জোর করে হাজতে ঢুকতে যাচ্ছি, সবাই মিলে আমায় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দিলে। আর সেই পাহারাওয়ালাটা ঘুষি খেয়েও দাঁত ছরকুটে হাসতে লাগল।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, ভারী দুঃখের কথা!

লোকটা বললে, এই জন্যেই তো মন খারাপ হয়ে যায় স্যার! কত কষ্ট করে চোর হয়েছি—এখন পাগল বললে কি ভালো লাগে—বলুন তো? অথচ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা বলে আপনি আমায় দুঃখু দিলেন।

আমি বললুম, বুঝতে পারি নি তাই বলেছি, কিছু মনে কোরো না। তা চুরি-চামারিতে কিছু হয়?

—একেবারে কিছু হয় না—তা বলব না স্যার! এই তো ক'দিন আগে এক ঢাকাই মহাজনের বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিলুম। সামনে ক্যাশবাক্স ছিল, আমি ভুল করে আর একটা কী ধরে টান দিলুম। দড়িতে বাঁধা ছিল, টানের চোটে ছিঁড়ে এল। বেশ ভারী, শক্ত—গোলগাল। বার করে আনতে মনে হল, সেটা যেন আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করছে। ব্যাপার কী—ক্যাশবাক্স কামড়ায়? অনেক ক্যাশবাক্স দেখেছি, গলা বের করে কামড়াতে চায়—এমন তো দেখি নি। আলোয় এনে দেখি—ধ্যাৎ—একটা কচ্ছপ! পরদিন দিলুম রাস্তার একটা লোককে বেচে—আটগণ্ডা পয়সা দিলে। একটা অবশ্য সীসের সিকি—তা হোক, চারগণ্ডা পয়সা তো পেলুম। কিছু লাভ তো হলই, কী বলেন?

বললুম, হ্যাঁ—কিছু লাভ হল বই কি!

লোকটা বললে, তবেই দেখুন কাজটা নেহাৎ মন্দ নয়। উঃ—নাকটা বেজায় জ্বলছে। একটা বিড়ি খাই—কী বলেন?

বললুম, তা খাও। তবে এবার আর মুখ পুড়িয়ো না।

—না স্যার, বার বার কি ভুল হয়!—বলে পাশের পকেট থেকে একটা মানি-ব্যাগ বের করে সে হাতের ওপর উপুড় করলে। বিড়ি বেরুল না—ছোট ছোট আলুভাজার মতো পাঁচটা নয়া পয়সা পড়ল।

—কী মুশকিল—বিড়িগুলো গেল কোথায়?

লোকটার বোকামি দেখে আমার গা জ্বলে উঠল। বললুম, ওটা মানি-ব্যাগ। ওর মধ্যে বিড়ি কী করে আসবে?

উঃ—নাকটা বেজায় জলছে। একটা বিড়ি খাই—কি বলেন?

—তা বটে—এটা মানি-ব্যাগ—লোকটা সেটাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল: সেই রুমাল নিয়ে কেলেঙ্কারী হওয়ার পরে একটা ব্যাগ

কিনেছি। বুক-পকেটে রাখি। যতই মনের ভুল হোক স্যার—নিজের বুক-পকেট কেউ মারতে পারে না। পারে স্যার ?

—একমাত্র তুমিই পারো বোধ হয়।

—না স্যার, তিনমাসের মধ্যে আমিও পারি নি। কিন্তু বিড়ি একটা না খেলেই নয়। বলে, আবার বিড়ি খুঁজতে যাচ্ছে, হঠাৎ ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজল।

—অ্যাঁ—তিনটে ? কী সর্বনাশ !

—সর্বনাশ কেন ?

—বাড়িতে বলে এসেছি যে। তিনটের মধ্যে না ফিরলে তারা ভাববে আমাকে পুলিসে ধরেছে। আপনি একটু উঠুন না স্যার !

—কেন ?

—আমাকে থানায় দিয়ে আসবেন।

এবার আমার ভারী রাগ হল। রাত দুপুরে এ কি জ্বালাতন ? একটু ঘুমুতে পেলুম না—এখন আবার থানায় দৌড়োই ? বললুম, তুমি বাড়ি যাও—আমার আর হাড় জ্বালিয়ো না।

লোকটা মিনতি করে বললে, একবারটি চলুন না স্যার, ধরিয়ে দিয়ে আসবেন। আমি বাড়িতে বলে এসেছি—

ধৈর্য আর কতক্ষণ থাকে ! আমি হঠাৎ বেদম চিৎকার করে উঠলুম ঃ গেট্ আউট্—বেরোও—বেরোও বলছি—

সেই চিৎকারে বিষম চম্‌কে লোকটা জানালা বেয়ে টপ্ করে লাফিয়ে পড়ল। কেঁউ করে একটা কাতর আর্তনাদ উঠল—বুঝলুম, নেড়ী কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। ভুল করে আবার জ্বালাতে না আসে, এই ভেবে শক্ত করে জানালাটা এঁটে দিলুম।

সকালে দেখি টেবিলের ওপর পাঁচটা আলুভাজার মতো নয়া পয়সা আর মানি-ব্যাগটা পড়ে আছে। আমার চশমার খাপটা পাওয়া গেল না—যাওয়ার সময় মানি-ব্যাগ ভেবে সেইটে নিয়েই পালিয়েছে।

———

লক্কানাথম্ কন্টুসুন্দরম্

বল্টুদার মন-মেজাজ ভয়ানক খারাপ। ঠিক একটা বল্টুর মতো মুখ করে বসে আছে।

যদ্দুর জানি, মন খারাপ করবার বান্দাই বল্টুদা নয়—অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গোল খেলে আলাদা কথা। নইলে বল্টুদা সব সময়েই বেশ উৎসাহিত থাকে—কিচ্ছুটিতে দমে যায় না। একবার থিয়েটারে বল্টুদাকে দূতের পার্ট দেওয়া হয়েছিল, রাজসভায় গিয়ে বলতে হবে, 'মহারাজ, অশ্ব কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না।' বল্টুদা সোজা গিয়ে বলে ফেলল, 'অশ্ব, মহারাজ কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না।' লোকে হৈ-হৈ করে উঠলে, বল্টুদা ক্ষেপে গেল। স্টেজের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল: "বলেছি, বেশ করেছি। আরো একশো বার বলব—অশ্ব, মহারাজ কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না; অশ্ব, মহারাজ কিছুতেই—"

বার পনেরো বলবার পরে সবাই মিলে বল্টুদাকে ভেতরে টেনে এনে ড্রপ ফেলতে হল।

এহেন দুর্দম বল্টুদা হঠাৎ নাকমুখ অমন বিচ্ছিরি করে নিমগাছতলায় বসে আছে কেন, জানবার জন্য ভীষণ কৌতূহল হল আমার।

টিপি টিপি এগোচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে পাঁচুগোপালের ক্ষেমঙ্করী পিসিমা এসে হাজির। এসে বেশ মিহি গলায় ডাকলেন, বাবা ঘোল্টু—

'ঘোল্টু' বলবার একটু ইতিহাস আছে। ক্ষেমঙ্করী পিসিমার কোন্ মাসশ্বশুরের মামাতো ভাইয়ের নামও নাকি বল্টু। তাই পিসিমা ও নামে ডাকতে পারেন না—শ্বশুরের নাম ধরতে নেই কি না! সেই জন্যে বরাবর 'ঘোল্টু'-ই বলে আসছেন। আজ কী যে হল, ডাক শোনামাত্র কোলা ব্যাংয়ের মতো চার পা তুলে লাফিয়ে উঠল বল্টুদা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, ঘোল্টু! আমার নাম ঘোল্টু নাকি? আমি ঘোল খাই নাকি? আমার কি ন্যাড়া মাথা আছে যেখানে সবাই ঘোল ঢালে? নাম খারাপ করবেন না—এই বলে দিলুম, হুঁ!

তিন দিনের এঁড়ে, এল শিং নেড়ে।

শুনে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা প্রথমে চোখ গোল করলেন, তার পরে গালে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে কাকের মতো হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন, ও—ম্মা গো! তিন দিনের এঁড়ে, এল শিং নেড়ে! খুব যে ন্যাজ বেরিয়েছে দেখছি—খামোকা হনুমানের মতো নাপাচ্ছিস্! আঃ—খেলে কচুপোড়া—বলে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা খুব কায়দা করে নাক বাঁকিয়ে চলে গেলেন।

তারপর আমি এগিয়ে এলাম গুটিগুটি।

—দেখলে বল্টুদা, কি রকম গাল দিলে তোমাকে। প্রথমে বললে, শিংওয়ালা এঁড়ে, তারপর বললে, ল্যাজওয়ালা হনুমান; তারপর বললে, কচুপোড়া খা!

বল্টুদা এবার হাঁড়োলের মতো মুখ করে বললে, বলুক। নিজেই কচুপোড়া খাকৃগে।

—তোমায় কিন্তু বিকেলে আম-কাঁঠাল খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। আমাকেও বলেছে—আসল খবরটা আমি এইবারে ফাঁস করলুম।

—অ্যাঃ, তাই নাকি?—বল্টুদা ধপাৎ করে আবার নিমগাছের গোড়ায় বসে পড়ল: তা আগে বললি নি কেন? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলি—না?

—বলবার চান্স্ তুমি দিলে কোথায়? তার আগেই তো তেরিয়া মেরিয়া হয়ে লাফিয়ে উঠলে।

—হুঁঃ, তাও বটে!—বল্টুদা এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে যে মনে হল রীতিমতো সাইক্লোন বয়ে গেল: কী জানিস্ প্যালা, দারুণ প্যাঁচে পড়ে গেছি। সে-ও ওই নামেরই ব্যাপার। প্রায় ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিলে। তাই তো ঘোল্টু শুনে ওই রকম ক্ষেপে গেলুম।

—তুমিও কারুর নাম খারাপ করে দিয়েছ বুঝি?—আমি ঘন হয়ে বল্টুদার পাশে বসলুম।

—আরে না—না!—বল্টুদা অন্যমনস্কভাবে একটা পাকা নিমফল মুখে দিয়েই থু-থু করে ফেলে দিলে: কী যাচ্ছেতাই ফল—রাম, রাম! দেখতে ঠিক পাকা আঙুরটির মতো, মুখে দিলে নাড়ী উল্‌টে আসে। মরুকগে—যে-কথা বলছিলুম। নাম খারাপ করলে অবিশ্যি গোলমাল এক-আধটু হয়। রাঙাদির বড় মেয়ে দিল্লীতে জন্মেছে, রাঙাদি

আদর করে নাম রেখেছে কুমারী রাজধানী চক্রবর্তী। আমি ভুল করে রাজধানীকে যেই দাদখানি বলে ডেকেছি অমনি মেয়েটা ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কান্না জুড়ল আর রাঙাদির সে কি বকুনি। তা সে সব তুচ্ছ কথা। সত্যি প্যালা, আমি দারুণ প্যাঁচে পড়ে গেছি এবার।

—কী প্যাঁচ, শুনি?

বল্টুদা আর একটা নিম ফল তুলে প্রায় মুখে দিতে যাচ্ছিল, আমি হাঁ হাঁ করে উঠতে ফেলে দিলে। বললে, ধুৎ! দেখতে পাকা আঙুরের মতো, আর খেলেই - মরুকগে! হয়েছে কী জানিস্ প্যালা? আমার ছোট মামা থাকে মাদ্রাজে—খুব বড় সরকারী চাকরি করে। পরশু সেই ছোট মামা কী একটা কাজে সাতদিনের জন্যে সিমলাতে গেছে।

—ছোট মামা সিমলাতে গেছে, তাতে তোমার প্যাঁচের কী হল?

—থাম্ না বাপু—আগেই কঁ্যাচর-ম্যাচর করিস্ কেন?

বল্টুদা উদাস হয়ে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, ঘুড়ি কেটেছে নাকি বল্টুদা?

বল্টুদা চটে গিয়ে বললে, ঘুড়ি—ঘুড়ি! দিনরাত ঘুড়ি ঘুড়ি করে গেলি। ইচ্ছে করে তোর পিঠে সুতো বেঁধে তোকেই আকাশে উড়িয়ে দিই। হচ্ছিল একটা দরকারী কথা—

—তা দরকারী কথাটা ঝাঁ করে বললেই তো হয়।

বল্টুদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, বলতে দিচ্ছিস্ কোথায়? তুইও তো ছোট মামার বাঁদরটার মতো আমার হাড় জ্বালাচ্ছিস্।

—ছোট মামার বাঁদর?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি! ছোট মামার একটা শখের বাঁদর আছে। সেটা হাসে, কাঁদে, নাচে, আবার কিচির-মিচির করে গানও গায়। ছোট মামা সিমলা যাওয়ার সময় সেটাকে রেখে গেছে আমাদের বাড়িতে। বলেছে, আদর করে নাম ধরে ডাকলেই বাঁদর এসে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, তারপর যা বলবি তাই করবে। ঘুরে ঘুরে হুলাহুলা নাচ নাচবে, ট্যাঙো ট্যাঙো বলে গান গাইবে—

আমি দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

—বাঁদর তো কিচ্‌কিচ্ করে, ট্যাঙো ট্যাঙো বলতে পারে নাকি? সত্যি বলছ?

—সত্যি মিথ্যে জানব কী করে? ছোট মামা তো এই কথা বলে তক্ষুণি দমদম থেকে প্লেনে চেপে হাওয়া। এদিকে বাঁদরটা সেই থেকে ছুঁচোর মতো মুখ করে বসে আছে তো বসেই আছে। খাচ্ছে না দাচ্ছে না, কথাটিও বলছে না, থেকে থেকে গা চুলকোচ্ছে আর পটাপট্ উকুন মারছে কেবল।

—তা নাম ধরে ডেকেই ছ্যাখো না —কী বলে।

আমি চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই বল্টুদা একটা নিম ফল মুখে পুরে দিলে। তারপর থু থু করে সেটাকে ফেলে দিয়ে আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল!

—ধুত্তোর নাম! ওই নাম নিয়েই তো যত ঝামেলা। ছোট মামা সব বলে গেল—কেবল নামটাই বলতে খেয়াল হয়নি। এখন বাঁদর ঠায় উপোস করে বসে আছে। কলা দিয়েছি, মুলো দিয়েছি, জিলিপি দিয়েছি—বললে বিশ্বাস করবিনে, আলুর চপ পর্যন্ত দিয়েছি।—বল্টুদার জিভে জল এসে গেল: কী দারুণ মনের জোর ছাখ্—আলুর চপ পর্যন্ত খেলে না। ওই ক'টা পুঁচকে উকুন খেয়ে ক'দিনেই বা বাঁচবে বল্‌দিকি? স্রেফ উপোস করেই মারা যাবে।

আমি নাক কুঁচকে বললুম, ছোঃ—বাঁদরের নামের জন্য আবার ভাবনা। ওর নাম আবার কী হতে পারে? রাম-শ্যাম-যত্নু-মধু কিংবা লম্বকর্ণ, কিংবা দধিমুখ, কিংবা জয়দ্রথ, কিংবা মলয়হিল্লোল—

বল্টুদা বিচ্ছিরি দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কিংবা পটলডাঙার প্যালারাম, কিংবা শিঙি-মাছের ঝোল, কিংবা পালাজ্বরের পিলে। থাম, আর বকিস্‌নি। কোনো নাম ধরে ডাকতে বাকী রেখেছি? শেষকালে বাংলা ডিক্‌শনারী খুলে 'অজগর' থেকে 'বাঁশবন'—মানে 'অ' থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত সমানে আউড়ে গেছি। উঁহু—কিচ্ছুটিতে সাড়া দিলে না।

—তা হলে হয়তো বাঁদরটার ইংরেজী নাম থাকতে পারে। জ্যাক্ কিংবা জিম, নইলে ক্যাটাক্লিজ্‌ম, নয় তো হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ—নয় তো কন্‌স্টার্নেশন—

বল্টুদা দু'হাতে কান চেপে ধরল: উঃ—এ যেন কানের কাছে কামান ছুঁড়ছে! তবু যদি ইংরেজীতে সাড়ে সতেরো না পেতিস্। বাহাদুরী ফলাতে হয় তো চল বাঁদরের কাছে—দেখি কেমন ওস্তাদ তুই।

আমি তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলুম।

গিয়ে দেখি, বাঁদরটার গলায় লম্বা শেকল বাঁধা। একটা জলচৌকির ওপর এমন কায়দা করে বসে আছে যে, মনে হয় জ্যামিতির একস্ট্রা ভাবছে! তারপরেই চিড়-বিড় করে সারা গা চুলকোতে লাগল আর মুখটাকে চামচিকের মতো করে (আমি অবিশ্যি চামচিকের মুখ কখনো দেখিনি) খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, বানরটার বোধ হয় খুব চুলকোনা হয়েছে—ওকে কার্বলিক সাবান মাখানো দরকার।—এমন সময় কোত্থেকে বল্টুদার বোন ঘুন্টি এসে হাজির। এসেই বাঁদরের সামনে বসে পড়ে চিৎকার করে গান জুড়ে দিলে :

'জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি—'

কিন্তু গানের সুরে বাঁদরের মন খুশি হল না।

'ইক্লুস্ পিক্লুস্ ইচাং ইচাং' বলে সে এমন একটা লাফ মারল যে, শেকলে বাঁধা না থাকলে ঠিক ঘুন্টির ঘাড়ে গিয়ে পড়ত। চ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে করতে ঘুন্টি সোজা ঘরের ভেতর ছুটে পালালে।

বল্টুদা হতাশ গলায় বললে, গ্রামোফোন এনে দেড়শো রেকর্ড শুনিয়েছি, খেয়াল থেকে কালী-কীর্তন কিচ্ছু বাদ দিইনি। তাতেও চিঁড়ে ভিজল না—আর ঘুন্টি কাঁই মাঁই করে ওকে ভোলাবে! দিত নাকটা আঁচড়ে—ঠিক হত।

আমি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লুম।

—ওতে হবে না। ঠিক নাম ধরে ডাকা চাই—তবেই না?

—ডাক না—সারাদিন ধরে ডাক। যে নামে খুশি ডাক—হাম্বা হাম্বা করে ডাক, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাক। বলিস্ তো ডিক্শনারী এনে দিই।

আমি বীরের মতো বললুম, ডিক্শনারীতে দরকার নেই—এমনিতেই ম্যানেজ করব। গোড়াতে বেশ মিষ্টি করেই ডাকা যাক। রামধন—

বাঁদর একটা উকুন ধরল।

—ব্রজবল্লভ—

উকুনটা পট্ করে চলে গেল মুখের ভেতর।

বাঁদর ফ্যাচাং করে আমাকে একটা ভেংচি কেটে দিলে

—যোগেন্দ্রকুমার—

—দধিকর্ণ—হরিপ্রসন্ন—নন্দপুরচন্দ্র—বৃন্দাবন-অন্ধকার—

বাঁদর ফ্যাচাং করে আমাকে একটা ভেংচি কেটে দিলে।

বল্টুদা খিক্ খিক্ করে হাসল।

—বললুম না, ডিক্শনারীর কোনো শব্দ বাকী রাখিনি? কিচ্ছু করতে পারবি না।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, থামো না বাপু—বলতে দাও আমাকে। রাক্ষস—খোক্কোস—কপিধ্বজ—বনহংসী ইন্দুনিভাননী—

বাঁদর ভীষণ জোরে খ্যাচাং খ্যাচাং করে গা চুলকোতে লাগল—যেন ছাল-চামড়া সব উপড়ে ফেলে দেবে! তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। মাদ্রাজের বানর, একটা মাদ্রাজী নামই ওর থাকা উচিত। ঠিক। দি আইডীয়া! ডাকলুম: মাদ্রাজম্—

বল্টুদা বললে, ও আবার কী! মাদ্রাজম্ মানে কী?

—ওরা সব অনুস্বার দিয়ে বলে, আমি জানি। বলতে দাও না আমাকে বিরক্ত কোরো না! মসলিপট্টম্

এবার বাঁদর যেন একটুখানি কান খাড়া করল।

উৎসাহ পেয়ে বললুম, তাঞ্জোরম্—

বাঁদর আমার মুখের দিকে প্যাট্‌প্যাট্ করে তাকাল। যেন বলতে চাইছে: বেশ হচ্ছে, চালিয়ে যাও।

আমি চেঁচিয়ে বলতে লাগলুম, কাঞ্জীভরম্—শিবসমুদ্রম্—ওয়ালটেয়ারম্—তারপরে আর মাদ্রাজের কোনো জায়গার নাম মনে এল না, আমি ধাঁ ধাঁ করে বলে চললুম: হিমাচলম্—পাঞ্জাবম্—গোবরডাঙাম্ (গোবরডাঙায় মেজ কাকিমার বাপের বাড়ি) জামসেদপুরম্—চিত্রকুটম্—পটলডাঙাম্—

যেই বলেছি পটলডাঙাম্—তক্ষুণি সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটল। তিনদিন ধরে কানের কাছে নানারকম নাম শুনতে শুনতে বানরটা তিতবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল পটলডাঙাম্ বলবার সঙ্গে সঙ্গে খেঁকী কুকুরের মতো মুখ করে আওয়াজ করল: কিঞ্চিৎ—কিঞ্চিৎ-উচ্চিংড়ে—ঘেংচু—

আর একখানা ভয়ঙ্কর লাফ!

সেই লাফে শেকল কটাং করে ছিঁড়ে গেল। আর বাঁদর তক্ষুণি 'হিঞ্চে—হিঞ্চে—

গুল্‌করা'—বলে পাঁই পাঁই করে তেড়ে এল আমার দিকে। আমি 'বাপ্‌রে মারে' বলে পালাতে যাব, হঠাৎ বারান্দা মোছায় ভিজে ন্যাকড়াটায় পা পড়তেই ধপাস্—ধাঁই করে উল্‌টে পড়ে গেলুম।

এবার আমি গেছি। বাঁদর আমার নাক-কান আর আস্তো রাখবে না। পটলডাঙার প্যালারামের পালাজ্বরের পালা এইখানেই শেষ!

আর তক্ষুণি মোটা গলায় কে যেন ডাকল, 'লঙ্কানাথম্ কট্টুসুন্দরম্ চিন্তার-পাণ্ডুরম্'—

বল্টুদার ছোট মামা। সাতদিনের কাজ তিনদিনে সেরেই ফিরে এসেছেন।

বাঁদরটা ঘ্যাঁক করে পেছন ফিরে তাকালে।

ছোট মামা আবার ডাকলেন, 'লঙ্কানাথম্ কট্টুসুন্দরম্ চিন্তারপাণ্ডুরম্'—

মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থেকেই আমি জুল-জুল করে চেয়ে দেখলুম, বানরটা 'ট্যাঙো ট্যাঙো' বলে গান ধরেছে আর দু'হাত আকাশে তুলে হুলাহুলা নাচ শুরু করে দিয়েছে।

জয়দ্রথ বধ

অর্জুন এসে আমাকে বললে, চল্ প্যালা, জয়দ্রথ বধ করে আসা যাক।

শুনেই আমি চমকে গেলুম। কারণ অর্জুন নিতান্তই কিছু আর মহাভারতের অর্জুন নয়—সে আমাদের পটলডাঙার মিত্র স্কুলের 'পিলার'--মানে ক্লাস টেনে তিনবার ফেল্ করে থামের মতো পাকাপোক্ত হয়ে আছে আমাদের হেডমাস্টার মশাই তাকে ডাকেন খর্জুর বলে। অর্জুন অবশ্য খর্জুর খেতে ভালোই বাসে, কিন্তু ওই খাদ্য বস্তুটি হতে তার নিজের একটু আপত্তি আছে।

•এহেন খর্জুর, থুড়ি, অর্জুন জয়দ্রথ বধ করতে চায় শুনে আমার কেমন যেন বিষম লেগে গেল।

অর্জুন বললে, হাঁ করে আছিস্ কেন? আমি কি তোর মুখে রসগোল্লা দিতে চেয়েছি নাকি?

আমি বললুম, না, প্রাণে ধরে কাউকে কোনো দিন তুই রসগোল্লা দিতে পারবি এ অপবাদ তোর সব চেয়ে শত্রু—মানে হেডমাস্টার মশাইও দিতে পারবেন না। কিন্তু তুই এই কলিকালে জয়দ্রথকে পাবিই বা কোথা, আর বধ করবিই বা কেমন করে?

অর্জুন বললে, ধ্যাৎ, তুই কোনো কাজের নোস্। খালি পেট ভর্তি পালাজ্বরের পিলে নিয়ে পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলই খেতে পারিস। আরে আমি বলছি দিকপাল সাহিত্যিক জয়দ্রথ বোসের কথা—যে ভদ্রলোক তিনশো তিপ্পান্নখানা উপন্যাস লিখেছেন।

আমি বললুম, তা খামোকা তাঁকে বধ করবি কেন? আমি তো তাঁর খানপাঁচেক বই পড়েছি—নেহাৎ খারাপ তো লেখেন না। তাঁর সেই যে বইটাতে বাঙালী ডিটেকটিভ্ হিমাদ্রিপ্রসাদ সাবমেরিন নিয়ে চীনে দস্যু চুং চাংকে প্রশান্ত মহাসাগরের ত্রিশ হাজার ফুট জলের তলায় গ্রেপ্তার করেছিল -সেটা তো দারুণ থ্রীলিং। তা ছাড়া তাঁকে যে বধ করতে যাচ্ছিস্, গায়ের জোরে কি পারবি? একটা মিটিংএ আমি তাঁকে দেখেছি। বিরাট মোটা- অ্যায়সা ভুঁড়ি

অর্জুন বললে, ধ্যাৎ, তুই জ্বালালি। তোর মাথার ভেতরে তুরপুন চালালে গোবরও বেরুবে না, বেরুবে ছাগলের নাদি! আরে সে বধ নয়। আজকাল বিনি পয়সায় লেখকদের কাছ থেকে বই বাগাচ্ছি আমি। এবার জয়দ্রথ বোসের পালা।

—বিনি পয়সায় লেখকরা বই দেন তোকে?—আমার রোমাঞ্চ হল: তুই বুঝি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ধরপাকড়—কান্নাকাটি, এই সব করিস?

—ধরপাকড়, কান্নাকাটি করব আমি ছোঃ!—অর্জুন তার খর্জুরবৃক্ষের মতো ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে, হাত-পা ছুঁড়ে বললে, আমি অর্জুন শিকদার—বুদ্ধির জোরেই ম্যানেজ করে নিই।

কাতর হয়ে বললুম, সেই বুদ্ধির একটু আমায়ও দে না ভাই। আমিও না হয় খানকয়েক বই ম্যানেজ করব।

অর্জুন বললে, হবে—হবে। চল্ আমার সঙ্গে। দেখবি আমায় কায়দাটা। এমনি জোরে ভস্মলোচনবাবুর মতো খিট্‌খিটে লোক - যার বাড়ির সামনে দিয়ে কুকুর পর্যন্ত হাঁটতে ভয় পায় - সেই ভস্মলোচন পর্যন্ত আমায় চার-চারখানা বই দিয়েছে।

—সত্যি?

—সত্যি কিনা নিজের চোখেই দেখবি। কিন্তু খবর্দার—একটা কথা বলবি না। আমি যা বলব—যা করব, সব দেখে যাবি, মাঝে মাঝে মাথা নাড়বি—ব্যাস্। বুঝেছিস্ তো! রাজী?

জয়দ্রথ বোস চেয়ারের ওপর উবু হয়ে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। আমরা ঢুকতেই বললেন, কী চাই?

অর্জুন আমায় চোখ টিপলে। তারপর বললে, আমরা বিউটি পিকচার্স কোম্পানী থেকে আসছি স্যার! আপনার বই ফিলিম করব। আমার নাম অর্জুন শিকদার—ফিলিম ডিরেক্টার, আর এ আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্যালারাম ব্যানার্জী।

জয়দ্রথবাবু বললেন, বসুন বসুন।

এদিকে ফিলিম ডিরেক্টার ফিরেক্টার শুনেই তো আমার ভিরমি লাগবার জো!

কী একটা বলে ফেলতে যাচ্ছি, অর্জুন পেছনে হাত নিয়ে কটাং করে আমায় চিমটি কাটলে আর আমি তখুনি মুখ বুজে একটা চেয়ারে বসে পড়লুম।

জয়দ্রথবাবু বললেন, বসুন বসুন।

জয়দ্রথ বললেন, তা আমার কী বই ফিলিম করতে চান ?

—আজ্ঞে চারখানা বই নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে—'রক্তমাখা তক্তপোশ', 'টিকিসহ ছিন্নমুণ্ড', 'শ্যাওড়া বনের হাতছানি' আব একখানা 'উকুনপুরের জোড়া খুন'। বই চারখানা যদি একবার আমাদের পড়তে দেন –

জয়দ্রথবাবু যেন মুখিয়েই ছিলেন। বললেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ আর বেশি কথা কী! এখুনি দিচ্ছি।

থেলো হুঁকো রেখে জয়দ্রথ বেরিয়ে গেলেন।

আনন্দে অর্জুনের চোখ মিটমিট করতে লাগল।

—দেখলি? এই হচ্ছে আমার কায়দা। ফিলিমের নাম শুনলে টাকার লোভে লেখকদের আর মাথার ঠিক থাকে না। এই করে কত বই আমি বাগিয়েছি—

—কিন্তু লেখকদের সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয়? পথে দেখে যদি চেপে ধরে?

—ইঃ, ধরলেই হল? বললেই হবে—না স্যার, শেষ পর্যন্ত বই পছন্দ হল না। ব্যাস্।

চটির চটাপট আওয়াজ করতে করতে জয়দ্রথ ফিরে এলেন। তারপর চারখানা বই অর্জুনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন। তা ফিলিম করছেন কবে?

—যত শিগগীর পারি।—এক গাল হেসে অর্জুন বললে, তিন-চার দিনের মধ্যেই খবর দেব। আজ তা হলে উঠি?

জয়দ্রথ বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যান।—বলেই ড্রয়ার থেকে একটা লম্বা মতন কাগজ বের করে বললেন, এর তলায় একটা সই করে দিন। আর ঠিকানাটাও লিখে দিন।

—সই কেন?—একটু যেন ঘাবড়েই গেল অর্জুন।

—কিছু না—কিছু না—আমার বাড়িতে মান্যি-গণ্যি কেউ এলে আমি তাঁদের অটোগ্রাফ রাখি। হ্যাঁ—ঠিকানাটাও দেবেন।

—ও এই কথা!—এক গাল হেসে অর্জুন তখুনি তার তলায় সই করে দিলে।

আমি অবিশ্যি অটোগ্রাফ খাতা অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম লম্বা কাগজে কাউকে অটোগ্রাফ নিতে দেখিনি। আবার কাগজটার মাথার ওপর টিকিট-ফিকিটের মতো কী সব ছাপা। কে জানে—বড় লেখকদের অটোগ্রাফের কাগজ হয়তো ওই রকমই হয়।

রাস্তায় বেরিয়ে অর্জুন প্রায় চার-পা তুলে লাফাতে লাগল: দেখলি—দেখলি তো প্যালা! কেমন মোক্ষম কায়দাটা! মুখের কথা পড়তে না পড়তেই চার-চারখানা বই। এমনি চাইলে তো দিতই না—বলত, কিনে নিয়ে পড়ো গে। ছাখ—খাতির করে বই তো দিলই—সঙ্গে সঙ্গে ডাঁটের মাথায় অটোগ্রাফও দিয়ে এলুম।

আমি বললুম, কিন্তু নিজের ঠিকানা দিয়ে আসিস্ নি তো?

—পাগল! অত কাঁচা ছেলে পেয়েছিস্ আমাকে? যা মনে এসেছে তাই লিখে দিলুম: ৫।৭।২ বাদুড়বাগান বাই লেন—এই যাঃ—ওটা যে রাঙা পিসের ঠিকানা!

বললুম, সর্বনাশ করেছিস্! যদি ওখানে খুঁজতে যায়?

অর্জুন বললে, ক্ষেপেছিস্? সময় আছে নাকি লেখকদের? ঠিকানাই যদি খুঁজে বেড়াবে, তা হলে তিনশ তিপ্পান্নখানা উপন্যাস লিখবে কখন? তা ছাড়া সে অ্যায়সা গলি যে সাতদিনেও বের করতে পারবে না। আচ্ছা প্যালা—গুড্ নাইট। চলি। টা—টা—

আমি বললুম, বা-রে! চারটে বই বাগালি, একটা আমায় পড়তে দিবি না? অন্তত 'উকুনপুরের জোড়া খুন'টা—

নাক কুঁচকে অর্জুন বললে, যা—যা! ইচ্ছে হয়, পয়সা দিয়ে কিনে পড় গে। বলেই বিশ্বাসঘাতক এক লাফে সামনের একটা দোতলা বাসে উঠে পড়ল।

ঠিক দশদিন পরে অর্জুন এসে হাজির হাউ-হাউ করতে করতে।

—প্যালারে, আমি গেলুম!

—কী হয়েছে?

—ওই জয়দ্রথ বোস! দু হাজার টাকার দাবিতে উকিলের চিঠি দিয়েছে রাঙা পিসের ঠিকানায়। রাঙা পিসে সেটা আবার পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের ঠিকানায়। আর বাবা সেটা খুলে পড়েছে!

—অ্যাঁ! চারটে বইয়ের দাম দু হাজার টাকা!

– আরে বইয়ের নয়, ফিলিমের! ওই যে আমাকে দিয়ে অটোগ্রাফ সই করাল না? ওটা স্রেফ শয়তানি—আমি কি জানি ওকে স্ট্যাম্প কাগজ বলে? সেই কাগজে আমি নাকি লিখেছি—এই চারখানা বই আমি ফিলিমের জন্য আট হাজার টাকার চুক্তি করেছি আর আগাম বাবদ দু হাজার টাকা এক হপ্তার মধ্যেই দেব। সে টাকা দিইনি বলেই এই উকিলের চিঠি!

—অ্যাঁ!

অর্জুন চিঁ চিঁ করে বলতে লাগল—বাবা হান্টার নিয়ে তাড়া করেছিল, কোনো মতে পালিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু এখন কী করি বল তো প্যালা—বাড়ি ফিরব কেমন করে?

প্যালারে, আমি গেলুম!

মহাভারতের অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছিল, কিন্তু কলির জয়দ্রথ অর্জুনকেই বধ করে ফেলেছে। আমি তাকিয়ে দেখলুম, অর্জুনের মুখটা এখন ঠিক খর্জুরের, মানে একতাল পিণ্ডিখেজুরের মতোই দেখাচ্ছে।

ঢাউস্

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললে, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্—ইয়াক্ ইয়াক্!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তার মানে কি?

টেনিদা টকটক করে আমার মাথার ওপর দুটো টোকা মারল। বললে, তোর মগজ ভর্তি খালি শুকনো ঘুঁটে—তুই এসব বুঝবিনি। এ হচ্ছে ফরাসী ভাষা।

আমার ভারী অপমান বোধ হল।

ফরাসী ভাষা? চালিয়াতির জায়গা পাওনি? তুমি ফরাসী ভাষা কী করে জানলে?

টেনিদা বললে, আমি সব জানি।

— বটে?—আমি চটে বললুম, আমিও তা হলে জার্মান ভাষা জানি।

—জার্মান ভাষা?—টেনিদা নাক কুঁচকে বললে, বল্ তো?

আমি তক্ষুণি বললুম, হিটলার নাৎসী—বার্লিন—কটাকট্!

হাবুল সেন বসে বসে বেলের আটা দিয়ে একমনে একটা ছেঁড়া ঘুড়িতে পট্টি লাগাচ্ছিল। এইবারে মুখ তুলে ঢাকাই ভাষায় বললে, হঃ কি জার্মান ভাষাই কইলি রে প্যালা! খবরের কাগজের কতগুলি নাম—তার লগে একটা 'কটাকট্' জুইড়্যা দিয়া খুব ওস্তাদী কোর্‌তে আছস্। আমি একটা ভাষা ক'মু? ক' দেখি—'মেকুরে হুড়ুম খাইয়া হকৈড় করছে'—এইডার মানে কি?

টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে আবার কিরে! ম্যাডাগাস্কারের ভাষা বলছিস্ বুঝি?

—ম্যাডাগাস্কার না হাতি!—বিজয়গর্বে হেসে হাবুল বললে, মেকুর কিনা বিড়াল হুড়ুম খাইয়া কিনা মুড়ি খাইয়া—হকৈড় করছে মানে এঁটো করছে!

হেরে গিয়ে টেনিদা ভীষণ বিরক্ত হল।

—রাখ বাপু তোর হুড়ুম হুড়ুম—শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়! এর চাইতে প্যালার জার্মান 'কটাকট্'ও ঢের ভালো।

বলতে বলতে ক্যাবলা এসে হাজির। চোখ প্রায় অর্ধেকটা বুজে খুব মন দিয়ে কী যেন চিবুচ্ছে। দেখেই টেনিদার চোখ দুটো জুল-জুল করে উঠল।

—অ্যাই খাচ্ছিস্ কিরে?

আরো দরদ দিয়ে চিবুতে চবুতে ক্যাবলা বললে, চুয়িংগাম।

—চুয়িংগাম!—টেনিদা মুখ বিচ্ছিরি করে বললে, দুনিয়ার এত খাবার জিনিস থাকতে শেষে রবার চিবুচ্ছিস্ বসে বসে! এর পরে জুতোর সুখতলা খাবি! ছ্যাঃ!

আমি বললুম, চুয়িংগাম থাক। কাল যে বিশ্বকর্মা পুজো সেটা খেয়াল নেই বুঝি?

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে না কেন? সেই জন্যেই তো বলছিলুম, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্—

ক্যাবলা পট্ করে বললে, মেফিস্টোফিলিস্ মানে শয়তান।

—শয়তান!—চটে গিয়ে টেনিদা বললে, থাম, থাম, বেশি পণ্ডিতি করিস্নি। সব সময় এই ক্যাবলাটা মাস্টারি করতে আসে! কাল যখন মেফিস্টোফিলিস্ ইয়াক্ ইয়াক্ করে আকাশে উড়বে—তখন টের পাবি।

—তার মানে?—আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম।

—মানে? মানে জানবি পরে—টেনিদা বললে, এখন বল্ দিকি, কাল বিশ্বকর্মা পুজার কি রকম বন্দোবস্ত হল তোদের?

আমি বললুম, আমি দু'ডজন ঘুড়ি কিনেছি।

হাবুল সেন বললে, আমি তিন ডজন।

ক্যাবলা চুয়িংগাম চিবুতে চিবুতে বললে, আমি একটাও কিনিনি। তোদের ঘুড়িগুলো কাটা গেলে আমি সেইগুলো ধরে ওড়াব।

টেনিদা মিট্‌মিট্ করে হেসে বললে, হয়েছে, বোঝা গেছে তোদের দৌড়। আমি কি ওড়াব জানিস্? আমি এই টেনি শর্মা?

টেনিদা খাড়া নাকটাকে খাঁড়ার মতো উঁচু করে নিজের বুকে দুটো টোকা মেরে বললে, আমি যা ওড়াব—তা আকাশে বোঁ-বোঁ করে উড়বে, গোঁ-গোঁ করে এরোপ্লেনের মতো ডাক ছাড়বে—হুঁ হুঁ। ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

* ঢাউস্ *

বাকিটা ক্যাবলা আর বলতে দিলে না। ফস্ করে বলে বসল, ঢাউস্ ঘুড়ি বানিয়েছ বুঝি ?

—বানিয়েছ বুঝি ?—টেনিদা রেগে ভেংচে বললে, তুই আগে থেকে বলে দিলি কেন ? তোকে আমি বলতে বারণ করিনি ?

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি আমাকে ঢাউস্ ঘুড়ির কথা বললেই বা কখন, বারণই বা করলে কবে ? আমি তো নিজেই ভেবে বললুম।

—কেন ভাবলি ?—টেনিদা রকে একটা কিল মেরেই উঃ উঃ করে উঠল : বলি আগ বাড়িয়ে তোকে এসব ভাবতে বলেছে কে র‍্যা ? প্যালা ভাবেনি, হাবুল ভাবেনি, তুই কেন ভাবতে গেলি ?

হাবুল সেন বললে, হ, ওইটাই ক্যাবলার দোষ। এত ভাইব্যা ভাইব্যা শ্যাষে একদিন ও কবি হইবো।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হুঁ, কবি হওয়া খুব খারাপ। আমার পিস্তুতো ভাই ফুচুদা একবার কবি হয়েছিল। দিনরাত কবিতা লিখত। একদিন রামধন ধোপা কাপড় নিতে এসেছে আর পিসিমা ফুচুদাকে কাপড়ের হিসেব লিখতে বলেছে। ফুচুদা ধোপার খাতায় কবিতা করে লিখল :

পাঁচখানা ধুতি, সাতখানা শাড়ী
এ-সব হিসাবে হইবে কি বা ?
এ জগতে জীব কত ব্যথা পায়
তাই ভাবি আমি রাত্রি দিবা !
রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা
মনটি তাহার বড়ই সাদা—
সে বেচারা তার পিঠেতে চাপায়ে
কত শাড়ী ধুতি প্যাণ্ট লইয়া যায়—
মনোদুখে খালি বোঝা টেনে ফেরে গাধা
একখানা ধুতি-প্যাণ্ট পরিতে না পায়।

টেনিদা বললে, আহা-হা, বেশ লিখেছিল তো! শুনে চোখে জল আসে।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, খুবই করুণ।

আমি বললুম, কবিতাটা পড়ে আমারও খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পিসিমা ধোপার হিসেবের খাতায় এই সব দেখে ভীষণ রেগে গেল। রেগে গিয়ে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা চালকুমড়ো নিয়ে ফুচুদাকে তাড়া করলে। ঠিক যেন গদা হাতে নিয়ে শাড়ীপরা ভীম দৌড়োচ্ছে!

টেনিদা বললে, তোর পিসিমার কথা ছেড়ে দে—ভারী বেরসিক। কিন্তু কী প্যাথেটিক্ যে কবিতা শোনালি প্যালা—মনটা একেবারে মজে গেল। ঈস্—সত্যিই তো। গাধা কত ধুতি-প্যান্ট-শাড়ী টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু একখানা পরিতে না পায়! —বলে টেনিদা উদাস হয়ে দূরের একটা শালপাতার ঠোঙার দিকে তাকিয়ে রইল।

সান্ত্বনা দিয়ে দিয়ে হাবুল বললে, মন খারাপ কইর‍্যা আর করবা কী! এই রকমই হয়। দ্যাখ না—গোবর হইল গিয়া গোরুর নিজের জিনিস, অন্য লোকে তাই দিয়া ঘুঁট্যা দেয়। গোরু একখানা ঘুঁইট্যা দিতে পারে না।

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, দিলে সব মাটি করে। এমন একটা ভাবের জিনিস—ধাঁ করে তার ভেতর গোবর আর ঘুঁটে নিয়ে এল। নে—ওঠ এখন, চাউস্ ঘুড়ি দেখবি চল!

—ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্ ইয়াক্ ইয়াক্—বলতে বলতে আমরা যখন গড়ের মাঠে পৌঁছুলুম তখন সবে সকাল হচ্ছে। চৌরঙ্গীর এদিকে সূর্য উঠছে আর গঙ্গার দিকটা লালে লাল হয়ে গেছে। দিব্যি ঝির্‌ঝির্ করে হাওয়া দিচ্ছে—কখনো কখনো বাতাসটা বেশ জোরালো। চারদিকে নতুন ঘাসে যেন ঢেউ খেলছে। সত্যি বলছি আমি পটলডাঙার প্যালারাম, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই—আমারই ফুচুদার মতো কবি হতে ইচ্ছে হল।

কখন যে সুর করে গাইতে শুরু করেছি—"রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই—" সে আমি জানিনে।

হঠাৎ মাথার ওপর কটাৎ করে গাঁট্টা মারল টেনিদা।

* ঢাউস্ *

—অ্যাই সেরেছে! এটা যে আবার গান গায়!

—তাই বলে তুমি আমার মাথার ওপর তাল দেবে নাকি?—আমি চটে গেলুম।

—তাল বলে তাল। আবার যদি চামচিকের মতো চিঁ চিঁ করবি তা হলে তোর পিঠে গোটা কয়েক ঝাঁপতাল বসিয়ে দেব সে বলে দিচ্ছি। এসেছি ঘুড়ি ওড়াতে, উনি আবার সুর ধরেছেন।

আমার মনটা বেজায় বিগড়ে গেল। খামোকো সকালবেলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ-সন্তানের মাথায় গাঁট্টা মারলে! মনে মনে অভিশাপ দিয়ে বললুম, হে ভগবান, তুমি ওড়বার আগেই একটা খোঁচা-টোঁচা দিয়ে টেনিদার ঢাউস্ ঘুড়ির ঢাউস্ পেটটা ফাঁসিয়ে দাও! ওকে বেশ করে আক্কেল পাইয়ে দাও একবার।

ভগবান বোধ হয় সকালে দাঁতন করতে করতে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার প্রার্থনা যে এমন করে তাঁর কানে যাবে—তা' কে জানত!

ওদিকে বিরাট ঢাউস্‌কে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা চলছে তখন। টেনিদা দড়ির মস্ত লাটাইটা ধরে আছে—আর হাবুল সেন হাঁপাতে হাঁপাতে পেল্লায় ঢাউস্‌টাকে ওপরে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু ঢাউস্ উড়ছে না—ধপাৎ করে নিচে পড়ে যাচ্ছে!

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, এ কেমন ঢাউস্ রে! উড়ছে না যে?

হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, হ, এইটা উড়বো না। এইটার থিক্যা মনুমেণ্ট উড়ান সহজ।

শুনে আমার যে কী ভালো লাগল। খামোকা ব্রাহ্মণের চাঁদিতে গাঁট্টা মারা! হুঁ হুঁ! যতই পটোল দিয়ে শিঙ্গিমাছের ঝোল খাই—ব্রহ্মতেজ যাবে কোথায়! ও ঘুড়ি আর উড়ছে না—দেখে নিও।

খালি ক্যাবলা মিট্‌মিট্ করে হাসল। বললে, ওড়াতে জানলে সব ঘুড়িই ওড়ে।

—ওড়ে নাকি?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তবে দে না উড়িয়ে।

ক্যাবলা বললে, তোমার ঘুড়ি তুমি ওড়াবে—আমি ও-সবের মধ্যে নেই। তবে বুদ্ধিটা বাতলে দিতে পারি। অত নিচ থেকে অত বড় ঘুড়ি ওড়ে? ওপর থেকে ছাড়লে তবে তো হাওয়া পাবে। ওই বটগাছটার ডাল দেখছ? ওখানে উঠে ঘুড়িটা ছেড়ে

ঢাউস্ উড়ছে না—ধপাৎ করে নিচে পড়ে যাচ্ছে!

দাও। ডালটা অনেকখানি এদিকে বেরিয়ে এসেছে- ঘুড়ি গাছে আটকাবে না,—ঠিক বোঁ করে উঠে যাবে আকাশে।

টেনিদা বললে, ঠিক। এ-কথাটা আমিই তো ভাবতে যাচ্ছিলুম! তুই আগে থেকে ভাবলি কেন র‍্যা? ভারী বাড় বেড়েছে—না? তোকে পানিশ্‌মেন্ট দিলুম। যা—গাছে ওঠ—

ক্যাবলা বললে, বা-রে! লোকের ভালো করলে বুঝি এমনিই হয়?

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, তোকে ভালো করতে কে বলেছিল শুনি? কোনো দিন লোকের ভালো করেছিস্ কি মরেছিস্। যা গাছে ওঠ—

—যদি কাঠপিঁপড়ে কামড়ায়?

—কামড়াবে। আমাদের বেশ ভালোই লাগবে।

—যদি ঘুড়ি ছিঁড়ে যায়?

—তোর কান ছিঁড়বে। যা—ওঠ বলছি—

কী আর করা—যেতেই হল ক্যাবলাকে। যাওয়ার সময় বললে, ঘুড়ির দড়িটা ওই গোলপোস্টে বেঁধে দিয়ো টেনিদা। অত বড় ঢাউস্—খুব জোর টান দেবে কিন্তু।

টেনিদা নাক কুঁচকে মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা—যা বেশি বকিস্‌নি। ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম—তুই এসেছিস্ ওস্তাদী করতে! নিজের কাজ কর—

ক্যাবলা বললে, বহুৎ আচ্ছা!

হু হু করে হাওয়া বইছে তখন। ডালের ডগায় উঠে ক্যাবলা ঢাউস্‌কে ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ-গোঁ করে ডাক ছেড়ে পেল্লায় ঢাউস আকাশে উড়ল।

টেনিদার ওপর সব রাগ ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে ঢাউস্‌কে। মাথার দু'ধারে দুটো পতাকা যেন বিজয়-গর্বে পত্‌পত্ করে উড়ছে—আর গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে ঘুড়ি ওপরে উঠে যাচ্ছে।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

কিন্তু আচমকা টেনিদার চেঁচানি বন্ধ হয়ে গেল। আর হাঁউ-মাউ করে ডাক ছাড়ল হাবুল।

—গেল—গেল—

—কে গেল ? কোথায় গেল ?

কে আর যাবে ? অমন করে কেই বা যেতে পারে টেনিদা ছাড়া ? তাকিয়ে দেখেই আমার চোখ চড়াৎ করে কপালে উঠে গেল। কপালে বললেও ঠিক হয় না—সোজা ব্রহ্মতালুতে।

শুধু ঢাউস্ই ওড়েনি। সেই সঙ্গে টেনিদাও উড়েছে। চালিয়াতী করে লাটাই ধরে রেখেছিল হাতে বাঘা ঢাউসের টানে সোজা হাত সাতেক উঠে গেছে ওপরে।

এক লাফে গাছ থেকে নেমে পড়ল ক্যাবলা। বললে, পাকড়ো– পাকড়ো—

কিন্তু কে কাকে পাকড়ায় ?

ততক্ষণে টেনিদা পনেরো হাত ওপরে ! সেখান থেকে তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে : হাবুল রে—প্যালা রে—ক্যাবলা রে—

আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম, ছেড়ে দাও—লাটাই ছেড়ে দাও—

টেনিদা কাঁউ-কাঁউ করে বললে, পড়ে যে হাত-পা ভাঙব !

হাবুল বললে, তবে আর কী করবা ? উইড়্যা যাও—

ঢাউস্ তখন আরো ওপরে উঠেছে। জোরালো পূরের হাওয়ায় সোজা পশ্চিমমুখো ছুটেছে গোঁ-গোঁ করতে করতে আর জালের জঙ্গে মাকড়সা যেমন করে ঝোলে—তেমনি করে মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে টেনিদা।

পেছনে পেছনে আমরাও ছুটলুম। সে কি দৃশ্য ! তোমরা কোনো রোমাঞ্চকর সিনেমাতেও তা দেখোনি !

ওপর থেকে তারস্বরে টেনিদা বললে, কোথায় উড়ে যাচ্ছি বল্ তো ?

ছুটতে ছুটতে আমরা বললুম, গঙ্গার দিকে।

-- অ্যাঁ ! ত্রিশূন্য থেকে টেনিদা কেঁউ-কেঁউ করে বললে, গঙ্গায় পড়ব নাকি ?

হাবুল বললে, হাওড়া স্টেশনেও যাইতে পারো !

—অ্যাঁ !

আমি বললুম, বর্ধমানেও নিয়ে যেতে পারে !

– বর্ধমান !—বলতে বলতে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, দিল্লী গেলেই বা আপত্তি কী? সোজা কুতুব মিনারের চূড়োয় নামিয়ে দেবে এখন।

টেনিদা তখন প্রায় পঁচিশ হাত ওপরে। সেখান থেকে গোঙাতে গোঙাতে বললে, এ যে আরো উঠছে! দিল্লী গিয়ে থামবে তো? ঠিক বলছিস্?

আমি ভরসা দিয়ে বললুম, না থামলেই বা ভাবনা কী? হয়তো মঙ্গল গ্রহেও নিয়ে যেতে পারে!

— মঙ্গল গ্রহ!— আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে টেনিদা বললে, আমি মঙ্গল গ্রহে এখন যেতে চাচ্ছি না। যাওয়ার কোন দরকার দেখছি না।

ক্যাবলা বললে, তবু যেতেই হচ্ছে। যাওয়াই তো ভালো টেনিদা। তুমিই বোধ হয় প্রথম মানুষ যে মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছ! আমাদের পটলডাঙার কত বড় গৌরব সেটা ভেবে দেখো!

—চুলোয় যাক পটলডাঙা! আমি—কিন্তু টেনিদা আর বলতে পারলে না! তক্ষুণি শূন্যে আর একটা ডিগবাজি খেল। খেয়েই আবার কাঁউ-কাঁউ করে বললে, ঘুরপাক খাচ্ছি যে! আমি মোটেই ঘুরতে চাচ্ছি না—তবু বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছি!

ঘুড়ি তখন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের কাছাকাছি।

আমরা সমানে পেছনে ছুটছি। ছুটতে ছুটতে আমি বললুম, ও-রকম ঘুরতে হয়। ওকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। সায়েন্স পড়োনি?

অনেক ওপর থেকে টেনিদা যেন কী বললে, আমরা শুনতে পেলুম না। কেবল কাঁউ-কাঁউ করে খানিকটা আওয়াজ আকাশ থেকে ভেসে এল।

কিন্তু ওদিকে ঢাউস্ যত গঙ্গার দিকে এগোচ্ছে তত হাওয়ার জোরও বাড়ছে। পেছনে ছুটে আমরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। টেনিদা উড়ছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে আর উড়ছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোড এসে পড়ল প্রায়। ঘুড়ি সমানে ছুটে চলেছে। এখুনি গঙ্গার ওপরে চলে যাবে! আমাদের লিডার যে সত্যিই গঙ্গা পেরিয়ে—বর্ধমান হয়ে—দিল্লী ছাড়িয়ে মঙ্গল গ্রহেই চলল! আমরা যে অনাথ হয়ে গেলুম!

টেনিদা আর্তস্বরে বললে, আমি মঙ্গল গ্রহে যেতে চাই না

আকাশ থেকে টেনিদা আবার আর্তস্বরে বললে, সত্যি বলছি—আমি মঙ্গল গ্রহে যেতে চাই না—কিছুতেই যেতে চাই না—

* ঢাউস্ *

আমরা এইবার একবাক্যে বললুম, না—তুমি যেয়ো না।

—কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে যে !

—তা হলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।- ক্যাবলা জানিয়ে দিলে।

—আর পৌঁছেই একটা চিঠি লিখো—আমি আরো মনে করিয়ে দিলুম : চিঠি লেখাটা খুব দরকার।

টেনিদা বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল নিশ্চয় চিঠি লিখবে, কিন্তু পুরোটা আর বলতে পারলে না। একবার কাঁউ করে উঠেই কোঁক্ করে থেমে গেল। আমরা দেখলুম, ঢাউস্ গোঁত্তা খাচ্ছে !

সে কি গোঁত্তা! মাথা নিচু করে বোঁ-বোঁ শব্দে নামছে তো নামছেই। নামতে নামতে একেবারে—ঝপাস্ করে সোজা গঙ্গায়! মঙ্গল গ্রহে আর গেল না—মত বদলে পাতালের দিকেই রওনা হল।

আর টেনিদা ? টেনিদা কোথায় ? সেও কি ঘুড়ির সঙ্গে গঙ্গায় নামল ?

না—গঙ্গায় নামে নি। টেনিদা আটকে আছে। আটকে আছে প্রিন্‌সেপ ঘাটের একটা মস্ত গাছের মগডালে! আর বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে একদল কাক কা-কা করে টেনিদার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে আমরা গাছতলায় এসে হাজির হলুম। কেবল আমরাই নই। চারদিক থেকে তখন প্রায় শ'দুই লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। পোর্ট কমিশনারের খালাসী, নৌকার মাঝি, দুটো সাহেব—তিনটে মেম !

—ওঃ মাই - হোয়াজ্ জ্যাট্ (হোয়াট্‌স্ ছাট্) ?—বলেই একটা মেম ভিরমি গেল।

কিন্তু তখন আর মেমের দিকে কে তাকায় ? আমি চেঁচিয়ে বললুম, টেনিদা, তা হলে মঙ্গল গ্রহে গেলে না শেষ পর্যন্ত ?

টেনিদা ঢাউস্ ঘুড়ির মতো গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে বললে, কাকে ঠোকরাচ্ছে।

—নেমে এসো তা হলে !

টেনিদা গাঁ গাঁ করে বললে, পারছি না! ওফ্ – কাকে মাথা ফুটো করে দিলে রে প্যালা !

পোর্ট কমিশনারের একজন কুলি তখুনি ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোন করতে ছুটল। ওরাই এসে মই বেয়ে নামিয়ে আনবে টেনিদাকে।

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি বললুম, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি--

সারা গায়ে আইডিন মাখানো টেনিদা কাতর স্বরে বললে, থাক, ও কথা আর বলিস্‌নি। তার চাইতে একটা করুণ কিছু বল্‌। তোর ফুচুদার লেখা 'রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধার' কবিতাটাই শোনা। ভারী প্যাথেটিক! ভারী প্যাথেটিক!

-শেষ-